বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

পরিবেশক—
অনিৰ্ব্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রন : ১৯৫৭

প্রকাশিকা :
কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী
ওল্ড ক্যালকাটা রোড
রহড়া, ২৪ পরগণা

মুদ্রক :
কিশোর কৃষ্ণ বর্ম্মা
রঘুনাথ প্রেস
২৬৫, গোপাল ঠাকুর রোড
কলিকাতা-৩৬

প্রচ্ছদ :
অরুণ গুপ্ত

॥ পূর্ব কথ

শ্রীগৌর লীলায় বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। গৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাব হয়েছিল কান্নার মন্ত্র নিয়ে। জীব-জীবনে এই মন্ত্র ছড়িয়ে দেবার ব্রতই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। সে কাজে যারা তাঁর একান্ত সহায় হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু সর্বাগ্রে থেকেও নিজেকে তিনি রেখেছেন সর্বপশ্চাতে। রয়েছেন অন্তরালের বাঁশরী হয়ে। বাজিয়েছেন কান্নার বাঁশরী। কেঁদেছেন। আর জীবকে কাঁদিয়েছেন। নিয়ে গিয়েছেন ঈশ্বরানুরক্তির পথে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। তিনি ঐশ্বর্যের অধিশ্বরী। তিনি কেমন করে সহ্য করবেন ব্রজের বিরহ? রাগানুগার বৃন্দাবিপিনে কি করে থাকবেন বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী? তাই তো সর্পরূপ বিরহ দংশনে তিনি দেহ রক্ষা করলেন। গৌর-জীবনের পট পরিবর্তন হল। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বিষ্ণুপ্রিয়া। গ্রহণ করলেন কান্নার মন্ত্র। কান্নাকে করে নিলেন জীবনের সঙ্গী। এ মন্ত্র গৌরাঙ্গসুন্দর দিয়েছিলেন গৌরাঙ্গীর কানে। বলেছিলেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে, 'প্রিয়ে, তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না। তোমাকে কাঁদাবার জন্যই আমাকে গৃহত্যাগ করতে হবে।'

করলেনও তাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। হলেন গৃহত্যাগী। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদলেন। কাঁদালেন জীবকে। গৌরবিরহে বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দন, আর কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধিকার কান্না স্বরূপত একই। ব্যাপক অর্থে এ হ'ল ভগবান রূপ কান্তর জন্য ভক্তরূপ কান্তার আজীবনের আর্তি। এ কান্না চির যুগের। চিরকালের। এ কান্নার বিরাম, বিশ্রান্তি, বিলয় কিছু নেই। আছে শুধু বিস্তার, বিলসন ও বিশ্রুতি। গৌরসুন্দর জীবকে এই মন্ত্র দান করবার জন্য নিজে কাঁদলেন। কাঁদালেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বিরহিণীর ব্যথায় কাঁদল জীব। এ কান্না কার জন্য? ঈশ্বরের জন্য? জীবকে ঈশ্বরমুখী করবার জন্যই গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল আবির্ভাব।

এ পুস্তক লিখতে যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীসুনীল চক্রবর্তী ও বেয়ু চক্রবর্তী অন্যতম। তাদের কাছে আমি ঋণী। এ পুস্তক পাঠে যদি কেউ আনন্দ পান, তবে আমার শ্রম সার্থক হবে।

জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া

প্রাক্ ভাষণ

বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন বিবহখিন্ন জীবন। পতি বিশ্বম্ভর মিশ্র, উত্তরকালের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ছিলেন রূপে গুণে পাণ্ডিত্যে অনন্যসাধারণ। এমন দেব-দুর্লভ কান্তি, এমন প্রাণ মন ভোলানো ব্যক্তিত্ব সেদিনকার নবদ্বীপে আর কয়জনের ছিল? সারস্বত জীবনের উত্তুঙ্গ শীর্ষে বিবাজিত থেকেও ভক্তিপ্রেমে রসাপ্লিত এমনটি আর কে ছিল সেদিনকাব নবদ্বীপে? এই অসামান্য পুরুষকেই পতিরূপে, দয়িতরূপে লাভ কবেছিলেন ভাগ্যবতী তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়া। জীবন তাঁর ভবে উঠেছিলো অপার প্রেমেব মাধুর্যে ও আনন্দে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মত এমন পাওয়া কেউ কখনো পায়নি, আবার সেই পরম পাওয়াতে হারিয়ে ফেলে এমন মর্মছেঁড়া কান্নাও কেউ কাঁদেনি।

কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ তাপসী জীবনে, বিরহ আর আর্তিতে বিহ্বল হয়ে থেকে, কিছুই কি পাননি বিষ্ণুপ্রিয়া? যদি না পেয়ে থাকেন, তবে কি নিয়ে আপন নিভৃত নিবাসে বেঁচে রইলেন তিনি সুদীর্ঘ একাশী বৎসর?

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন প্রেমধর্মের মূর্ত বিগ্রহ, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন তাঁর স্বরূপশক্তি। তাই ব্যবহারিক জীবনে যা কিছু ঘটুক না কেন, শ্রীচৈতন্য আর বিষ্ণুপ্রিয়াব যুগনদ্ধ আত্মিক জীবনে ছিলনা কোন সত্যকার বিচ্ছেদ বা অন্তরাল।

মিলন বিরহের আরো একটা মাধুর্যময় তত্ত্ব পাই বৈষ্ণব সাধকদের আন্তর সাধনায়। 'বিরহকে' তাঁরা বলেছেন, বিশেষ রূপে রহা—আত্মিক ভালোবাসার এ এক অপরূপ রসঘন অস্তিত্ব।

আরো একটা তত্ত্ব পাই বৈষ্ণব সাধক-কবির পরম রম্য কাব্যে—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে
বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
একঃ স এব সঙ্গমে
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ম বিরহে।

(পদ্যাবলী)

—মিলন আর বিরহের ভেতর বিরহকেই তো করি আমি বরণ। কারণ, মিলনে পাই আমার প্রিয়কে 'এক'-রূপে,। আর বিরহে দেখি তাঁকে সারা ত্রিভুবনময়।

স্বামী রূপে যে বিশ্বম্ভর মিশ্র ছিলেন একান্তভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজস্ব পরম ধন, বিরহের তপস্যাময় জীবনে, সেই তিনিই এসেছিলেন তাঁর কাছে সর্বময় রূপে। পরম পাওয়া পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে আলেখ্য এঁকেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এই চরিত কথাকে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে যেমন তিনি আকর্ষণীয় করেছেন, তেমনি করেছেন তাকে ভাবময়, কাব্যময়। ভাবুক ও রসিকজন এ গ্রন্থ পড়ে তৃপ্তি পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

—শঙ্করনাথ রায়

বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া

॥ এক ॥

একটি মেয়ে আসে গঙ্গায়।

রোজ আসে।

কি সুন্দর মেয়েটি। ছোট্ট টুকটুকে দুখানা পা ফেলে ফেলে ধীর মন্থর গতিতে সে আসে। স্নিগ্ধ দুটি চোখ। আনত মস্তক। বিনম্র স্বভাব। বরণ গৌর। দিব্য দীপ্ত কান্তি। জোছ্‌না-স্নাত দেহ। এ যেন প্রত্যুষের প্রসন্নতা। সুচির সমুদ্র।

বয়স কত?

দশ এগারোর বেশী নিশ্চয়ই নয়।

তবে সে কেন আসবে গঙ্গায়? একদিন নয়, দু'দিন নয়, রোজ। তাও আবার ত্রিসন্ধ্যা। গঙ্গার প্রতি শৈশব থেকেই তার গভীর টান। গঙ্গাকে বড় ভাল বাসে মেয়েটি।

কিন্তু এই ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করে যে পুণ্য অর্জন—তার ও কি বোঝে? শচীদেবীর মনে নানা প্রশ্ন। নানা জিজ্ঞাসা, কে এ মেয়েটি? ওকে দেখলেই যে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতে। ও যে স্নেহের সমুদ্র তরঙ্গায়িত করে তোলে। দৃষ্টিকে কেড়ে নেয়।

সূর্য তখনো ওঠেনি। আরক্তিম দিগন্ত। পাখীর কণ্ঠে প্রভাতের বন্দনা। শচীদেবী জেগেছেন। জেগেছে নবদ্বীপের নগর জীবন।

এক হাতে একটি ঘটি। আর এক হাতে একখানা কাপড়। ধীর পদপাত। শচীদেবী চলেছেন গঙ্গাস্নানে। নিত্য দিনের অভ্যাস।

অন্তরে নিরন্তর আকুল কান্না। বেদনায় বুকটা ভেঙ্গে যেতে চায়। খেয়াল থাকেনা কোনো দিকে। উন্মনা শচীদেবী। শুধু কান্না আর কান্না। নীরব কান্নার মধ্যেই তাঁর ইষ্টায়ত্বের আর্তি।

বড় ব্যথা। বড় দুঃখ শচীদেবীর। তাইতো নিরন্তর অন্তর চাইছে ঈশ্বরের পদ-স্পর্শ—আর কেন? এবারে ডাক দাও। জাগতিক দহনদীর্ণ হাহাশার থেকে মুক্ত কর প্রভু। ঠাঁই করে দাও তোমার চরণ তীর্থে।

আজকাল প্রায়ই শচীদেবী এ ভাব নিয়ে থাকেন।

কোনো কাজের বিরতি নেই। নিত্যকারের কর্ম কুশলতায় নৈপুণ্যের বিন্দু শৈথিল্য হয়না পরিলক্ষিত। কিন্তু কি যেন তাঁর নেই। কি যেন তার চাই। চাওয়ার সাধনায় শচীদেবী রিক্ত, শূন্য, নিথর, নিস্পন্দ। তবুও যতদিন প্রাণ, ততদিন গান। ততদিন আর্তি আর আকুলতা।

তাই তো রোজ আসেন শচীদেবী—

আসেন গঙ্গায় স্নান করতে। আর সেই দেখা হয়ে যায় স্নিগ্ধ শান্ত সেই মেয়েটির সঙ্গে।

শচীদেবী অপলক। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির পানে। লক্ষ্য করেন তার গতিবিধি।

ধীরে অতি ধীরে মেয়েটি নামে গঙ্গায়। স্নান করে। আস্তে আস্তে সিক্ত বসনে উঠে আসে ওপরে। প্রণাম জানায় সূর্যদেবকে। উজার করে দেয় অন্তরের অর্চনা। ভক্তির আবেশে অবস হয়ে আসে দেহ। চোখ দুটি যায় বুজে।

শুধু সূর্যদেবকে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে শচীদেবীর চরণেও প্রণাম রাখে মেয়েটি। কিছু

জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পাননা শচীদেবী। মেয়েটির পানে তাকাতেই অমনি ছুটে যায় পালিয়ে।

শচীদেবী নির্বাক দর্শকের মত থাকেন তাকিয়ে। বারে বারে মনেব দিগন্তে শুরু হয় প্রশ্নের শর বর্ষণ—কে, কে, এই মেয়ে!

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ শচীদেবী। শুধু দেখেন আর দেখেন।

কত লোক গঙ্গায় আসে। স্নান করে চলে যায়। কৈ, কেউ তো শচীদেবীর পায়ে প্রণাম রাখেনা।

ভেবে ভেবে কুল পাননা শচীদেবী। অজস্র প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে। কিন্তু কাকে কি শুধাবেন? মেয়ে যে ক্ষণ কণাটিও সুযোগ দেয়না। শুধু নিবেদনের মৌন শান্তিই ওর সান্ত্বনার আশ্বাস।

কি নিবেদন করে?

নিবেদন করে কতগুলো কামনার কুসুম। মেয়ের মনে যে মগ্নতা এসেছে। এসেছে মিলনের মাধুর্য্য। কৃষ্ণ প্রেমের সায়রে ফুটেছে কৃষ্ণ কমল। তাইতো মেয়েটি ভক্তিমাত। তাইত মেয়ে অভিসারিকা। নিবেদন করছে তাঁর অন্তরের অজস্র আকুতি যশোদারূপী শচীদেবীর চরণারবিন্দে।

অপূর্ব সুন্দর মেয়ে। সুলক্ষণা। সুস্নিগ্ধা। সুমধুরা। সুরেখান্বিত ললাট। আকর্ণ বিস্তৃত লোচন। উন্নত নাসা। মিষ্টি অধর। আলুলায়িত কুন্তল। আনিতম্ব বিস্তার। সমস্ত মুখে মাখা চুয়ানো সোহাগ। অন্তর দ্বারে দর্শন মুগ্ধ দুটি মঙ্গল কুম্ভ। অঙ্গে অঙ্গে লীলায়িত ছন্দ। কার যেন আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ।

আজ আর ছাড়ছিনে বাছা। সব জেনে নেব। নাম। ধাম। গোত্র। বংশ। সব জেনে তবে ছুটি।

ধীর মন্থর গতি। এগিয়ে আসছে মেয়েটি। এগিয়ে আসছে শচীদেবীর দিকেই।

আজ আর নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন না শচীদেবী।

হ্যাঁ, ঠিক তাঁর কাছে এসে গেল মেয়েটি। কি সুন্দর!

দুখানা চরণ ফেলে ফেলে দেবছন্দে এগিয়ে আসছে সে। যেন রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

সদ্য স্নাতা সুচী শুদ্ধা বালিকা। একটি ফুলের মত লুটিয়ে পড়ল শচীদেবীর চরণে।

—বাঃ, বেশ মেয়ে তো! সুখে থাক! মনের মত বর লাভ কর। জন্ম এয়োত্রী হও তুমি!

করুণাময়ীর কণ্ঠ থেকে নির্ঝরিত হল করুণা।

চনমনে হয়ে উঠল মেয়েটি। মাথা নীচু করল। লজ্জায় লাল হয়ে গেল মুখ। আনন্দের শিহরণে ছলছল চোখ। এ যেন উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে অশ্রান্ত হিম বর্ষণ। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো উৎকর্ণ। পারছেনা মুখ তুলে তাকাতে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে শচীদেবীর সম্মুখে।

মধুর কণ্ঠে শচীদেবী শুধালেন, 'কি নাম তোমার মা?'

'প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া।'

—বাঃ, বেশ নাম। প্রিয়াই তো তুমি। দেব প্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া। এমন যার রূপ, সে তো দেবতারই প্রিয়া। সার্থক নামা।

'কার মেয়ে গা?'

'আমি সনাতন মিশ্রের মেয়ে।'

সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় শচীদেবীর কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে এল 'সনাতন মিশ্রের মেয়ে তুমি!'

তুমি তো মস্ত ঘরের মেয়ে। আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। সুন্দর হও। বিষ্ণু-প্রিয়া হও। কৃষ্ণ-প্রিয়া হও।

শচীদেবীর মুখে উচ্চারিত হল বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের মন্ত্র। অন্তরের কান্না।

মাগো, আমাকে অধিকার দাও। অর্জনের অধিকার। পূজার অধিকার। তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়বার অধিকার। তুমি না কৃপা করলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হবেনা।

আত্মনির্ভরতার মধ্য থেকেই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে আত্ম সমর্পণ। বিষ্ণুপ্রিয়া যে তার দেহমন প্রাণ নিমাইকে নিবেদন করে বসে আছে।

সে কি আজ?

শৈশবের লীলা লীন প্রত্যূষে সে ঢুকেছে পূজার মন্দিরে। মনের অঙ্গনে তখন তার বিচিত্র সমারোহ। প্রিয়া তন্ময়। তন্দ্রায় ক্লিষ্ট তার অন্তর। এই আসে আবার হারিয়ে যায়। কৃষ্ণ-ছায়া। কৃষ্ণ-তনু। পীতবাস পরিহিত মোহন বেণু হাতে এক কিশোর। কণ্ঠে মতির মালা। মস্তকে চূড়া। পায়ে নূপুর, আহা কি রূপ! প্রিয়া চোখ ফেরাতে পারে না।

খেলার সাথীর মত তাকে সে আপন করে নিল।

এসো কৈশোর! প্রিয়া এখন কিশোরী।

কার কিশোরী?

কৃষ্ণ-কিশোরী।

আপন মনে বসে থাকে। দেখে কৃষ্ণ-কান্তি। গোপনে মালা গাঁথে। পড়ায় পিতার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু বিগ্রহে। আকুল আকুতির কুসুম ফোটে মনের বৃন্তে। ঝরে তা অশ্রুফুল হয়ে। একান্তে প্রিয়া প্রার্থনা করে কৃষ্ণ-প্রেম! কৃষ্ণ-প্রীতি!

কৈশোর যায় যায়। যৌবনের উষাক্ষণ। প্রিয়া ব্যাকুলা। তার যৌবন তীর্থে তীর্থপতির পদধ্বনি। আশৈশব-বন্দিত শ্যামসুন্দর আজ অন্তর কুঞ্জে এসে গৌর রূপে নন্দিত। তবে কি, তবে কি তুমিই আমার সেই আরাধিত দেবতার নবকলেবর? ওগো, আমার দেহ মন প্রাণ তোমার চরণে উৎসর্গ করলাম। তুমি আমাকে বঞ্চিত করোনা।

প্রাণের কান্নায় প্রাণের জন সাড়া দেয়। টেনে নেয় কাছে। এতদিন প্রিয়া ছিল তার একটি স্বতন্ত্র ভুবনে। কিন্তু আজ যে ঘটেছে এক বিরাট রূপান্তর। শচীদেবী এসে তার রুদ্ধ দুয়ার

দিলেন খুলে। একটি তরঙ্গ তুলে দিলেন তার কৃষ্ণ সায়রে। প্রিয়া অস্থির। উচাটন। নিরন্তর নির্মম দহনের মধ্যে এ এক অদ্ভুত আশ্বাস বাণী—তুমি কৃষ্ণ-প্রিয়া।

'বিষ্ণু-প্রিয়া। জন্ম এয়োত্রী হও।'

কিন্তু কি নিয়ে যাবে প্রিয়া? কি আছে তার? কোন সম্পদে বিভূষিত করবে সেই বিশ্ব সম্রাটকে?

না, আমার কিছু নেই। আছে শুধ তপ, জপ আর তিতিক্ষা। তপে তোমাকে তুষ্ট করব। জপে যাচনা করব তোমাকে অন্তরে। আর তিতিক্ষায় আকুল হয়ে পথ চেয়ে থাকব। তুমি কি আসবে না? তোমার নাম করতে করতে, তোমাকে ডেকে ডেকে কান্নায় বক্ষ ভাসিয়ে দিয়েও কি পাবনা তোমার দর্শন?

প্রিয়া তখনো দাঁড়িয়ে। কি করে পথ চলবে? শচীদেবী যে তার অন্তর সমুদ্রে ঝড় তুলে দিয়েছেন। প্রিয়ার মাথার ওপর হাত রাখলেন শচীদেবী। করলেন আশীর্বাদ। এগিয়ে চললেন ঘরের পথে।

কিন্তু পা চলছেনা শচীদেবীরও। বারে বারে তাকাচ্ছেন পিছন ফিরে। দেখছেন সেই গৌরাঙ্গী গৌরীর রূপ। সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস যেন শচীদেবীকে উন্মনা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্লান্তিবৃত্তে ছায়ার মত সঞ্চারিত হল আর একটি নারীমূর্তি। মুহূর্তে হারিয়ে গেলেন তিনি—হারিয়ে গেলেন অতীতের একটা সমাপ্তিহীন অধ্যায়ের মর্মান্তিক মুহূর্তে। অন্তর হাহাকারে ডুকরে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন শচীদেবী—নেই, নেই, মোর লক্ষ্মীপ্রিয়া নেই!

॥ দুই ॥

কান্না আর কান্না।

কাঁদবার জন্যই তো সংসারে আসা। কান্নাই সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক।

জীবনের আদি উষায় মানুষ একবার কাঁদে। জীবনের শেষ সন্ধ্যায় আর একবার। মাঝখানটা বড় জটিল। বড় মর্মান্তক। এখানে বিভ্রান্তি। বেদনা। দুঃখ। যাতনা। অশান্তি মৃত্যু।

কিন্তু কেন?

বিস্মৃতি।

তবে কি এ থেকে মুক্তি নেই মানুষের?

আছে।

কি করে?

যেখান থেকে উৎসার, সেখানেই উৎসাদ।

চোখ রাখ সতর্ক প্রহরীর মত মনের সুগহনে। অটল দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে ধরে রাখ হৃদয়ের মন্দিরে। দুয়ারে প্রহরী করে দাঁড় করাও বিশ্বাস কে। দেখো, শুধু দেখো।

কি দেখবে?

শ্বাস আর প্রশ্বাস।

ওর ওঠা আর নামা। কোথা থেকে আসে। কোথায় যায়। সঙ্গে যুক্ত করে দাও একটিনাম। তোমার একান্ত প্রিয় পরিজনের নাম। জপ কর। নামে নামে নামি নেমে আসবেন। মুছিয়ে দেবেন তোমার মনের সব মালিন্য। সব দুঃখ। সব যাতনা।

সবই অকাট্য। তবুও শচীদেবীর চোখে জল। আর সে সচ্ছ অশ্রুর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে প্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি।

শচীদেবীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেগেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর বিস্মৃত জীবনের পরিচ্ছেদটি তুলে ধরেছে শচীদেবীর চোখের সামনে। আকুল শচীদেবী। আর যেন পারছেন না। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছেন প্রিয়াকে। ওকে বড় আপন লাগে। ও যেন কত কালের চেনা মেয়েটি।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে পেয়ে এমন হল কেন শচীদেবীর ?

এমনই হয়। প্রিয়জনকে কাছে পেলে বেদনার সমুদ্রটা উথলে ওঠে। সব ভার সব কান্না ইচ্ছে করে তার কাছে গচ্ছিত রাখতে।

এক এক করে আটটি কন্যা এল শচীর কোলে। কত আশা—স্নেহ দিয়ে বুকের স্তনধারায় ওদের মানুষ করবে। কিন্তু নৈস্ফল্যের অন্ধকারে সব গেল অবলীন হয়ে। কোরকেই ঝড়ে গেল, কুসুম হয়ে আর ফুটলনা। রেখে গেল বাবা-মার বুকে তীব্র আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস।

জগন্নাথ মিশ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত। তিনি কিন্তু ঠিক শচীর মত পড়েননি ভেঙ্গে। দুঃখ পেয়ে কেঁদেছেন। মায়াবদ্ধ জীব তো কাঁদবেই। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে ঈশ্বরের দান বলে মুখ বুজে নিয়েছেন গ্রহণ করে। কারণ সুখে তুমি। দুঃখে কি তুমি নেই ? নিশ্চয়ই আছ। সুখে দুঃখে তোমার সমান প্রকাশ। তাইতো অহরহ প্রার্থনা—সুখে কর বিগতস্পৃহ, দুঃখে কর নিরুদ্‌বিগ্ন প্রাণ।

তবুও মাঝে মাঝে প্রাণের পাঁজর ঠেলে নেমে আসে কান্নার ঢল। মিশ্র তখন দৃঢ় করে ধরেন তাঁর রঘুনাথকে। অশ্রুতে ধুয়েদেন চরণ যুগল। রিক্ত হয়ে যান। সিক্ত করেদেন রঘুনাথের পাষাণ বিগ্রহ—আর কত কাঁদাবে রঘুনাথ !

রঘুনাথ কৃপা করলেন। তাকালেন মুখ তুলে। শচীদেবীর কোলে এল বিশ্বরূপ। এল তাঁর নবম গর্ভে।

প্রাণ হরণ কান্তি। চোখ জুড়িয়ে যায় তাকে দেখলে। জ্ঞানে গুণে ও ব্যবহারে নবদ্বীপের অতি প্রিয়জন বিশ্বরূপ। দিন কাটে ধর্মকর্ম নিয়ে। দিন কাটে চতুষ্পাঠী, টোল, শাস্ত্র আর কীর্তনে।

বিশ্বরূপ এসেছে জমি চাষ করতে। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে ফলবে সোনার ফসল। আসবেন রাজার রাজা। তাইতো পথ নিকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বরূপ। ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে পথে পথে।

উন্মনা বিশ্বরূপ। তার অন্য ভাব। আসক্তি নেই ঘরের পানে। বিষয়ে বসেনা মন। যেন আর সময় নেই। ত্রস্ত বিশ্বরূপ। তাড়াতাড়ি সমাধা করছে কাজ। বুঝিবা শুনতে পেয়েছে বেণুধ্বনি। শুনতে পেয়েছে তাঁর পায়ের শব্দ। তিনি আসছেন।

ওদিকে কমলাক্ষ মিশ্রের ঘুম নেই চোখে। থামেনা তাঁর কান্না। বৈষ্ণবাচার্য্য কমলাক্ষ। দীক্ষা পেয়েছেন মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে। সাধন আর ভজন। কান্না আর কাতরিমা। শ্যামসুন্দরকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়েন কমলাক্ষ—প্রভু এসো। আর কাল হরণ করোনা। বড় দুর্দিন। জীব জীবনে নেমে এসেছে অনাচার। মায়া নেই, দয়া নেই, ভালোবাসা নেই, প্রেম নেই। নেই সাধন, ভজন, তপ ও তিতিক্ষা।

অবিশ্বাসের অভিশাপে মানুষ নেমে যাচ্ছে পশু পর্যায়ে। হে প্রভু, তুমি এ দুর্দিনের আঁধাব সায়রে এস আলোর মশাল নিয়ে। তুমি না এলে কে তাদের রক্ষা করবে? কে দেখাবে পথ?

কমলাক্ষের কণ্ঠে কান্নার কাতরিমা—নৈয়ায়িকগণ তোমার অস্তিত্বে সন্দিহান। বৈদান্তিক বলছেন, সোহং—আমিই ঈশ্বর। তার্কিকের ভাষায়—তুমি অপ্রকাশ। তুমি নেই। জীব কার পূজা করবে প্রভু!

প্রেম ধর্মী বৈষ্ণব আজ নির্যাতিত, নিন্দিত। ওঁরা জ্ঞানের গর্বে তাঁদের প্রেমকে করছে উপেক্ষা। বলছে ওসব ভক্তির ঢং।

প্রভু তুমি কৃপা কর।

পশ্বাচারে আবদ্ধ জীব। বীরাচারের নামে চলছে অসংযমের ব্যভিচার। দিব্যাচারের দিব্য দ্যুতি কামনার কুক্ষিতে রুদ্ধ-শ্বাস।

এমন দুর্দিনেও কি তুমি আসবেনা? তবে কি সব আশা ও আশ্বাস মিথ্যা? তুমিইতো জীবকে শুনিয়েছ—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানং অধর্মস্য তদাত্মনম্ সৃজাম্যহম ॥'

কমলাক্ষ মানে অদ্বৈতাচার্য। রোজ বসেন বৈষ্ণবদের নিয়ে সভা মিলিয়ে। পাঠ করেন গীতা ও ভাগবত। বৈষ্ণবগণ শোনেন উন্মুখ হয়ে। অদ্বৈতাচার্য্য দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে যান তাঁর অন্তরের কথা—শাস্ত্র-জ্ঞানেও নয়, কর্মেও নয়। আজ চাই ভক্তি। অচলা ভক্তি। অনিমিত্যা ভক্তি। কারণ দিনকে দিন জীব যে ভক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে রূঢ় রুক্ষ তর্কের পথে এগিয়ে। তর্ক করে কি তর্কাতীতকে পাওয়া যায়? আজ চাই শুধু কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন।

কিন্তু অদ্বৈতের কথা কজন লোক শোনে? তারা যে বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন। দুঃখ পেলেন অদ্বৈতাচার্য। পথ খুঁজতে লাগলেন মনের মৌনকে মন্থন করে। অবশেষে কথা কয়ে উঠল মনের মৌন। জানিয়ে দিল পথ ও মন্ত্র।

কি সে পথটি?

যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে প্রচার করেন ভক্তি তবেই জীব উদ্ধার পেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভূত করবার পন্থাটি কি?

স্মরণ, চিন্তন ও পূজন।

অদ্বৈতাচার্য তাই-ই করতে লাগলেন। মনপ্রাণ ঢেলে শুরু করলেন কৃষ্ণ আরাধনা। পূজনীয়কে পূজো করতে করতে অদ্বৈতাচার্য হারিয়ে ফেলেন জ্ঞান। পূজান্তে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান

জানিয়ে দিতে থাকেন হৃদ-বিদারণ হুঙ্কার। এ যে প্রাণ নিঙড়ান আহ্বান। ভুবন মোহন শ্যামসুন্দর কি আর ঠিক থাকতে পারেন? তাঁর রাজসিংহাসন উঠল টলে। তিনি তাঁর প্রতাপের কনকাসনে আর কেমন করে বসে থাকবেন? এদিকে যে ভক্ত প্রাণ আকুল। শুধু কৃপা ভিক্ষা নয়। চাই তোমার সাবয়ব সমুপস্থিতি।

ওদিকে ঘটল এক অঘটন। ১৪০৬ শক। মাঘ মাস যায় যায়। শচীদেবীর দেহে হ'ল কৃষ্ণাবেশ। শুরু হল অদ্ভুত সব লীলা বিলাস। শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র বিস্ময়ে গেলেন মূক হয়ে। দেখতে লাগলেন নয়ন-লোভন বিলাস বিভূতি।

বললেন একদিন মিশ্র—

বললেন শচীদেবীকে—এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম।

শচীদেবী আগ্রহে এগিয়ে এলেন—কি দেখলে?

মিশ্র বললেন—দেখলাম স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় নিয়েছেন তোমার অঙ্গে। অবস্থান করছেন আমাদের কুটিরে। সবাই তোমাকে সম্মান করছে। পাঠিয়ে দিচ্ছে ধন-ধান্য বস্ত্রাদি।

শচীদেবী বললেন—তুমি এই দেখলে? আমি কি দেখেছি জান?

—কি?

—দিব্যজ্যোতি দেবতাগণ আকাশ থেকে স্তুতি করছেন।

মিশ্র ভক্তিপ্লুত অন্তরে বলতে লাগলেন—তা হলে তুমিও দেখেছ!

আমি দেখলুম এক জ্যোতির্ময় রশ্মি প্রবেশ করল আমার হৃদয়ে। তারপরে গেল তোমার হৃদয়ে। জান, আমার কি মনে হচ্ছে?

—কি মনে হচ্ছে?

—আমার মনে হচ্ছে কোনো এক মহাশয় ব্যক্তি আসছেন।

এযে তাঁরই আগমন আভাষণ। তাঁরই অবতীর্ণ হবার প্রাক-পর্ব।

ভক্তিস্নাত অন্তরে তাঁরা দুজনে সেবা করতে লাগলেন শালগ্রাম শীলার।

দেখতে দেখতে শচীদেবীর গর্ভের ত্রয়োদশ মাস গেল অতিক্রান্ত হয়ে। এখনো হলনা কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ। জগন্নাথ মিশ্রের মুখ গেল ম্লান হয়ে। চিন্তাচ্ছন্ন তিনি। কি হল! এমন তো হয়নি কোথাও।

নীলাম্বর চক্রবর্তি আশ্বস্ত করলেন মিশ্রকে। গণনা করে বললেন—এমাসে শুভক্ষণে তোমার ঘরে আসছে এক পুত্র সন্তান।

আতকে উঠলেন মিশ্র—সত্যি! তবে কি তিনি আসছেন তাঁর প্রতাপের মুকুট রেখে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে!

১৪০৭ শক। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। ফাল্গুন মাস। পূর্ণিমা তিথি।

সন্ধ্যা নামে ধীরে। কিন্তু এমন তিথিতে জ্যোছনা কৈ?

রাহু বুঝি বললে—চাঁদ তুমি মুখ লুকাও। পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হচ্ছে মর্তে।

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে মুখ লুকাল সকলঙ্ক চন্দ্র। রাহু করল তাকে গ্রাস। কৃষ্ণনামে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। হরি হরি বলে জগদ্বাসী অভিনন্দিত করল গৌরকৃষ্ণকে। প্রসন্নতার ঢল নামল নবদ্বীপের নগর জীবনে।

নদীয়া রূপ উদয়গিরিতে উদয়ণ হল পূর্ণচন্দ্ররূপ গৌর হরির।

বিস্ময়ে নির্বাক শচীদেবী। এ যে ভুবন মোহন রূপ। এমন শিশু কি মানুষের ঘরে আসে।

মালিনী বললে—এমন রূপ তো আর দেখিনি কখনো! এ কে?

মিশ্রর অঙ্গনে বেজে উঠল শঙ্খ। হুলুধ্বনিতে ঘর বার গেল এক হয়ে। ঘোষিত হল প্রভুর আগমন বার্তা। এলেন পতিত পাবন জীবন-বন্ধু। অদ্বৈতাচার্যের কান্নায় অবতীর্ণ হলেন নদীয়া-জীবন। অবতীর্ণ হলেন জীবকে রক্ষা করতে। ধর্মকে সংস্থাপন করতে।

ওদিকে প্রভুর আগমন ক্ষণে অদ্বৈতাচার্য ছিলেন আপন গৃহে। ছিলেন সেখানে ঠাকুর হরিদাসও উপস্থিত। সহসা তাঁরা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আরম্ভ করলেন নৃত্য করতে।

কিন্তু কেন এ নৃত্য? কেন এ হুঙ্কার?

তখন পর্যন্ত প্রভুর আগমন বার্তা তো তাঁদের কানে পৌঁছায়নি! তবে ওঁরা নাচে কেন? কেন হুঙ্কার দেয়?

ভক্তের হৃদয় যে ভগবানের বৈঠকখানা। ভগবান স্বয়ং এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অদ্বৈত আর হরিদাসের হৃদয় মন্দিরে। তাই তো এ শিহরণ। তাই তো এ নর্তন!

শুধু কি তাই?

সকল ভক্তের মনেই বিপুল সাড়া।

অদ্বৈতাচার্য বললেন—হরিদাস, চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে। চল গঙ্গা স্নানে যাই।

গঙ্গায় এসে দেখেন চন্দ্রশেখর এসেছে। এসেছে শ্রীবাস। তাদের মনেও অথৈ আনন্দ। সবাই হরিসংকীর্তনে মুখর।

হরিদাসঠাকুর ইঙ্গিতে বললেন অদ্বৈতাচার্যকে—সকলের মনে এত আনন্দ কেন? একি কোনো শুভ আবির্ভাবের আভাস?

তিনি যে জানান দিয়ে আসেন। সবার মনেই এক প্রশ্ন। এক জিজ্ঞাসা। এ কি? এ কেন?

ক্রমে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। ভক্তির অশ্রুতে ভক্তগণ আপ্লুত। আর ভয় নেই। তিনি এসেছেন! এসেছেন জীবকে রক্ষা করতে। জীব জীবনে ঈশ্বরীয় আবেশ আনতে।

নবদ্বীপের ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেল। সবাই আসতে লাগল দেব শিশুকে দর্শন করতে শচীমায়ের অঙ্গনে। মিশ্রের আনন্দ আর ধরেনা।

ওদিকে অদ্বৈতাচার্যের ভার্যা সীতাদেবী স্বামীর আদেশে দেখতে এলেন বালগোবিন্দকে। নিয়ে এলেন স্বর্ণে বাঁধানো কড়িও বকুল

বীজ। নিয়ে এলেন রৌপ্য মুদ্রা যুক্ত পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ ও কঙ্কণ। দুটি বাহুর জন্য নিয়ে এলেন শঙ্খ রৌপ্য নির্মিত বাঁকমল। স্বর্ণমুদ্রার বিবিধ হার। স্বর্ণ জড়িত ব্যাঘ্রনখ। কোমরের জন্য আনলেন পট্টসূত্রের তাগা। বিবিধ আভরণ নিয়ে এলেন হস্ত পদের জন্য।

শচীমাতার জন্য আনলেন রেশমী শাড়ী। পাড়যুক্ত রেশমের ভূমিফোতা চাদর। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। সঙ্গে কিছু অর্থ কড়িও আনলেন।

বালকের রূপ দেখে মুগ্ধ সীতাদেবী—এযে গোকুলের সাক্ষাৎ কানাই। কেবল অঙ্গের বরণে ভেদ।

আশীর্বাদ করলেন সীতাদেবী—দুই ভাই চির জীবন লাভ কর। ডাকিনী শাকিনীর কথা ভেবে আতঙ্কিত হলেন সীতাদেবী। ওরা অপদেবতা। যদি শিশুর অনিষ্ট করে! তাই সীতাদেবী শিশুর নাম রাখলেন—'নিমাই'।

নিমাই নাম রেখেছিলেন শচীদেবীও। কারণ শিশু ভূমিষ্ট হয়েছিল নিমগাছের নীচে। তাই শচীদেবী বললেন—আমি ছেলের নাম রাখলেম—'নিমাই!'

কিন্তু অন্য সবাই ?

শিশুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তি নবজাতকের পানে তাকিয়ে বললেন—জন্মলগ্নে শিশুর সারা অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে মহাপুরুষের লক্ষণ। বিভিন্ন চিহ্ন ওর দেহে বিদ্যমান। এ শিশু এসেছে সংসারকে ত্রাণ করতে। বিশ্বের ভার বহন করতে! সুতরাং এর নাম রাখা হোক—বিশ্বম্ভর।

কিন্তু মেয়েরা বললে অন্যকথা—ওর নাম রাখা হোক গৌরহরি। কারণ হরি-ই-যে এসেছে গোরা বেশে।

আর একদল সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল—এমন যার অঙ্গ-কান্তি, তার নাম 'গৌরাঙ্গ' ছাড়া আর কি হতে পারে?

নহাজারো নামে লাখো নামে ডাকো। প্রাণের সুরে যে নাম ধরে ডাকবে, সেই নামেই যে সাড়া দিবেন নদীয়া-সুন্দর। ডাক শুনেই যে তিনি এসেছেন।

এগিয়ে চলে দিন। মাস যায়। বছর যায়।

ক্রমে এসে পদার্পণ করল নিমাই নবছরের কোঠায়। তার যে অনন্ত নাম। আনন্দের হুল্লোড় পড়েগেল শচীমায়ের অঙ্গনে। প্রাঙ্গণ হয়ে উঠল মুখর। শঙ্খ বাজছে। বাজছে মৃদঙ্গ। নিমাই-এর উপনয়ণ। সবাই ব্যস্ত।

বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর। একটি বৃন্তে দুটি ফুল।

মিশ্রের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছেন রঘুনাথ। মুছে দিয়েছেন শচীর চোখের জল। এ সংসার তো সংসার নয়, যেন সারাৎ-সার। বিশ্ব পরিবারের তীর্থ নিকেতন।

বিশ্বরূপের বয়স হয়েছে। পদার্পণ করেছে যৌবনে। এবারে বিয়ে-থা দেবার ব্যবস্থার কথা ভাবছেন মা-বাবা। শচীর যেন আনন্দ আর ধরেনা। খুব সুন্দর দেখে মেয়ে আনবেন তিনি বিশ্বরূপের জন্য।

মেয়ে দেখাদেখি চলল বিশ্বরূপের জন্য। সংবাদটি কেমন করে যেন কানে গেল তার। মনটা উঠল চনমন করে। বৈরাগী বিশ্বরূপ। অন্তর তার গোপীযন্ত্র সম্বল করে পথ চলে। তাকে ঘরে বাঁধবার চেষ্টা হচ্ছে।

বেঁকে বসল বিশ্বরূপ। বন্ধু লোকনাথকে বলল, 'তবে আমি সন্ন্যাসী হব।'

লোকনাথ বন্ধু হলেও বিশ্বরূপের একান্ত অনুগামী। ছায়া সঙ্গীর মত। সেও ছাড়ছেনা বিশ্বরূপকে। যদি তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর, তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

চলল আয়োজন। একদিন একখানা বই নিয়ে এসে দাঁড়াল

মায়ের সামনে বিশ্বরূপ। বইটি দিল মায়ের হাতে। বলল, 'নিমাই বড় হলে এই বইটা তাকে দিও। বলো, তোর দাদা দিয়েছে।'

শচীদেবী বললেন, 'আমি দেব কেন? তুই-ই দিবি। এ তুই রেখে দে তোর কাছে।'

বিপাকে পড়ল বিশ্বরূপ। নানা ছলে বোঝাতে চাইল মাকে —এই ধর কোথাও যদি বিদেশ, বিভুঁয়ে যাই, তবে তো পরে আর মনেই থাকবে না। তুমিই বইটা রেখে দাও মা।

সরলা শচীমা। হাত পেতে গ্রহণ করলেন বই। বিশ্বরূপ যেন মস্ত একটা দায়িত্ব থেকে পেল মুক্তি।

আর ভাবনা নেই বিশ্বরূপের। এবারে সে মুক্ত বিহঙ্গ। আজন্মের মত চলে যাবে সে, চলে যাবে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে। কিন্তু যাবার আগে ঐ ছোট ভাই নিমাইকে কিছু দিয়ে যেতে হয়তো! তাই রেখে যাচ্ছে মায়ের কাছে পুঁথিখানা।

কিন্তু মিথ্যার ছল করলেও কণ্ঠ কেঁপে ছিল বিশ্বরূপের। মা স্নেহে অন্ধ। তাই কিছুই বুঝতে পাবেন নি। বিশ্বরূপ কিন্তু কেঁদেছে। মায়ের অন্তরালে দাঁড়িয়ে গোপনে ফেলছে চোখের জল!

শীত-স্নাত রজনী। দুটো যাম অতিক্রান্ত! রাত্রির শেষ যাম। বিশ্বরূপ দূর থেকে প্রণাম করল মায়েব চরণে। পিতার উদ্দেশ্যে রাখল নমস্কার। তাকাল একবার নিমাই-এর পানে। বুকটা হু-হু করে উঠল। যেন গঙ্গার খ্যাপা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তার দুচোখে।

অঝোরে কান্না এল বিশ্বরূপের। বড় স্নেহের, বড় আদরের নিমাই তার! তাকে আজ ছেড়ে যেতে হবে! ক্ষণ বিরতি! মুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে এল বিশ্বরূপের। ছিঁড়ে ফেলে দিল মায়ার বাঁধন। বলল লোকনাথকে—লোকনাথ আর দেরি নয়! চল এবারে।

বাবা-মা এবং ছোট ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিশ্বরূপ বেরিয়ে পড়ল জীবন পথের পথিকের সন্ধানে।

রাত ভোর হল। দিকে দিকে পড়ে গেল সাড়া। বিশ্বরূপ নেই! সে সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছে।

মায়ের চোখে জল। মিশ্র বেদনায় নির্বাক। নিমাই দাদা নেই শুনে পড়ল মূর্ছিত হয়ে।

মায়ের চোখে জল। অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শচীদেবী। দুটো প্রস্ফুট কমলের মত চোখ মেলে তাকাল নিমাই। মায়ের কান্না তাকে আকুল করে দিল। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন নিমাই —দাদার জন্য তুমি কেঁদোনা মা। আমি তোমার সব দুঃখ দূর করে দেব।

কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র আর সামলে উঠতে পারলেন না। বৃদ্ধ হয়েছেন। এত বড় আঘাত কি করে সইবেন। জ্বর এল। কয়েকটা দিন ভুগলেন মাত্র। তারপরে বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন সংসারের দহন দুঃখ থেকে।

মুছে গেল শচীর এয়োতির চিহ্ন। কিছুই রইল না তাঁর। সব যেন শূন্য। শান্ত। সমাহিত। ঐ নয়নের মণি—নিমাই শুধু সম্বল। তাওকি বিশ্বাস আছে এ জাত কে। ওরা বাপ মাকে কাঁদাতে পটু।

॥ তিন ॥

একটা দহন-দীর্ণ হাহাকার নিয়ত শচীদেবীর অন্তর মন্থন করে চলেছে। ঝড়ের পরে ঝড়। বড় মর্মান্তিক। বড় বেদনাবহ। পুত্র গেল। গেল মায়ের বুকে শেল বিদ্ধ করে। তার পরেই স্বামীর বিয়োগ ব্যথা। একি সহ্য করা যায়?

কিন্তু নিমাই-এর অন্য ভাব। মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেন তিনি। শোনান সান্ত্বনার বাক্য। যেন বলতে চান—আমাকে দেখ। আমাকে ভালবাস। তবেই তোমার সব সন্তাপ দূর হয়ে যাবে।

"মামেকং শরণং ব্রজ।"

তাইতো। লৌকিক জগতের গণ্ডি পেড়িয়ে দেখ—নিমাই কে? নিমাই কি?

ধীরে ধীরে শচীদেবীর মনের দুঃখ তিরোহিত হতে লাগল। নিমাইকে বুকে ধরলে তাঁর সব ব্যথা যেন পরম শান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অপলক তাকিয়ে থাকেন মা, তাকিয়ে থাকেন নিমাইয়ের মুখের পানে। করেন সংসারের সব কাজগুলো।

জ্ঞানতীর্থ নবদ্বীপ। নিমাই নবদ্বীপের পণ্ডিত। চৌদ্দ বছরের ছেলে। খুলে বসলেন টোল। আশ্চর্য! বড় বড় পণ্ডিতেরা তো আমলই দিতে চায়না। কিন্তু ছাত্রদের মুখে অন্য কথা—অদ্ভুত পড়ান নিমাই পণ্ডিত। এমন পড়া শুনিনি কোথাও।

ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে ছাত্রদের ভিড়। জলের মত অর্থ আসে। ঘুচে যায় শচীদেবীর অভাব আর অনটন।

ছোট বড় সবার মুখে ও বুকে নিমাই। নিমাই—নিমাই—নিমাই। চতুর্দিকে ঐ একটি নামের প্রতিধ্বনি। নিমাই নামে

আজ মাথা নত করে নদীয়ার নগর-জীবন। জানায় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। খ্যাতিমান পণ্ডিত। সম্মানের শিখর তীর্থে তাঁর আসন। এমন হয়না। এমন আর হবে না।

এবারে আর ভাবনা কি? পাড়া পরশি আসে। আসে শচীদেবীর কাছে। বলে—এবারে ছেলেকে বিয়ে থা দাও। ঘর বাঁধ। সংসারে আবদ্ধ কর পণ্ডিতকে।

তোমাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

সেদিন টোল থেকে বাড়ির পথে ফিরছেন নিমাই। দেখা হয়ে গেল বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে। মনটা কেমন যেন চনমনে হয়ে উঠল। মিলন হল চার চোখের। নিমাইয়ের মনে উদয় হল পূর্বলীলার কথা। পূর্বলীলায় নিমাই ছিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি। আর লক্ষ্মী ছিলেন তাঁরই অঙ্কশায়িনী। এ যে সেই লক্ষ্মী! এক রকম নীরব সম্মতি দুজনকে করল আন্দোলিত। নিমাই ফিরলেন বাড়িতে। লক্ষ্মী গেলেন গঙ্গা স্নানে।

আশ্চর্য যোগাযোগ। সে দিনই আবার বনমালী ঘটক এলেন শচীদেবীর কাছে। রাখলেন এক প্রস্তাব। কি সে প্রস্তাব?—একটি কন্যার খোঁজ এনেছি মাগো। ছেলের বিয়ে দেবে তো?

—নিশ্চয়। তা মেয়ে কেমন গা? কার মেয়ে?

—বল্লভাচার্যের মেয়ে। নাম লক্ষ্মী।

শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা—লক্ষ্মী! আমাদের সেই লক্ষ্মী। তাকে যে আমি চিনি গো। সে মেয়ে তো আমার পরিচিতা। —তবে আর কথা কি।

কি যেন ভাবলেন শচীদেবী। কয়েকটি চিন্তার রেখা কুঞ্চিত হল ললাটে। সহসা বলে উঠলেন—ও যে—

আর বলতে পারলেন না কিছু। শুধু একটু হাসলেন। কৈশোরে ছিল এই লক্ষ্মী নিমাই-এর লীলা সঙ্গিনী। কত খেলা

খেলেছে দুজনে। সে কত কাহিনী। কত কথা। শচীদেবী কিচ্ছু ভুলে যান নি।

স্নান করতে গঙ্গায় আসত মেয়েরা। আসত হাতে নিয়ে পূজার থালা। থাকত তাতে ফুল, বেলপাতা আর মিষ্টি মণ্ডায় সজ্জিত নৈবেদ্য। মনে তাদের ত্রস্ততা। নিমাই এলেই সর্বনাশ। পূজা অর্চা কিচ্ছু হবেনা। সব যাবে পণ্ড হয়ে। তাড়াতাড়ি করত। আর ভাবত এই বুঝি নিমাই এলো! এই বুঝি নিমাই এলো।

কিন্তু একি! বিতারণের মধ্যেই যে আমন্ত্রণের আকুতি। ইষ্ট স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই গৌর তনুর আভাতি। মুগ্ধ বিস্ময়ে নয়ন মুদে তাকিয়ে থাকে ওরা, তাকিয়ে থাকে সেই বিশ্ববিমোহন গৌরাঙ্গ সুন্দরের পানে।

পড়তে বসেছিল নিমাই। সহসা চাঞ্চল্য এলো। অনুভব করল একটা প্রবল আকর্ষণ। ছুটতে ছুটতে চলে এলো গঙ্গার ঘাটে। পড়ল ঝাপিয়ে। পায়ের জল ছিটে এল স্নানার্থীদের সারাটা দেহে। রেগে তারা আগুন। করল তিরস্কার।

ওরা বুঝল না কার চরণ ধোয়া বারি সিঞ্চিত হল তাদের দেহে। এযে শান্তি আশীর্বাদ। সকল দহন হরণ নির্যাস।

নিমাই-এর কি আর কোনো দিকে খেয়াল আছে? কে কি বলল সেদিকে কান দেবার অবসর নেই তার। সে যে ভক্তের কাছে এসেছে প্রচ্ছন্ন ভাবে। এসেছে ছোট হয়ে। তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে।

গঙ্গা থেকে উঠে এল পারে। ছুটে গেল মেয়েদের কাছে। ঢল ঢল চোখে তাদের পানে তাকিয়ে বলতে-লাগল, 'আমাকে পূজো কর। আমি তোদের বর দেব।

মেয়েরা ঝলসে ওঠে—কেরে আমার। 'তুই কি দেবতা, যে তোর পূজো করব আমরা'?

সহসা নিমাই গম্ভীর হয়ে বলে, 'দেবতা নয় তো কি'।

—থাম!

কে থামবে। জোড় করে ওদের ফুল আনল সাজি থেকে। মাথায় রাখল। কেড়ে নিয়ে এল মিষ্টি মণ্ডা। টপাটপ মুখে পুড়ে দিল। মুহূর্তে সব শেষ। হা করে তাকিয়ে রইল মেয়েরা। রাগে দুঃখে ক্ষোভে বলল, 'বড় বাড় বেড়েছিস, না? ঠাকুর দেবতার নৈবেদ্য কেড়ে খেলি! বুঝবি। মজাটা টের পাবি পরে।'

নিমাই দ্বিধাহীন। আরো এগিয়ে যায় ওদের সামনে। বলে, 'এই, আমাকে বিয়ে করবি'?

লজ্জায় লাল হয়ে যায় মেয়েদের মুখ। অস্ফুটে বলে—কি অসভ্য!

তাকায় এদিক ওদিক। বুঝিবা কেউ শুনে ফেলল। চোখে চোখ রাখতে পারেনা নিমাইয়ের। সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। থর থর করে কাঁপতে থাকে তাদের অঙ্গ। ঠিক এমনি এক মগ্ন মুহূর্তে বলে ওঠে নিমাই "দেনা, তোরা ঐ ফুলের মালা আমার গলায় পড়িয়ে!'

গলা বাড়িয়ে দেয় নিমাই। ওরা যেন নিশ্চল পাষাণ। মুখের কথা পর্যন্ত গিয়েছে বন্ধ হয়ে। মনে মনে লজ্জায় মরে যাচ্ছে যেন।

এবারে নিমাই রাগে ফেটে পড়ে। বলে—দিলিনা তো! বেশ!' তোদের বুড়ো বর হবে!'

বুড়ো বরের কথা শুনে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ চাপা কণ্ঠে গুমরে ওঠে। করে ভর্ৎসনা। কিন্তু নিমাই নির্বিরোধের অঙ্গনে সঙ্গী-সন্ধানে ব্যস্ত। পূজো চায়। মালা চায়। চায় ভক্তের প্রিয় সম্ভাষণ।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়েছিল অদূরে। তার হাতেও পূজার থালা সজ্জিত। নিমাই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তার কাছে। তাকাল মুখের পানে। বলল—আমাকে পূজো করবে তুমি?

নীরব সম্মতি—করব।

এগিয়ে এল লক্ষ্মী। দিল নিমাই-এর চরণ যুগলে ফুলের অর্ঘ্য। গলায় পড়িয়ে দিল মালা। ললাটে চন্দন। ভ্রু-সন্ধিতে দিয়ে দিল কুমকুমের তিলক। পূজো করতে করতে লক্ষ্মী তন্ময়। তন্ময় হয়ে সে তার মনের মানুষটিকে সাজাচ্ছে। লক্ষ্মী মগ্না। সু-প্রসন্না। পূজো শেষ হল। হাতে তুলে দিল নৈবেদ্যের থালা। মনে মনে বলল—গ্রহণ কর আমার পূজো।

এবারে প্রণাম পর্ব। নিবেদনের পূর্ণাহুতি।

লুটিয়ে পড়ল লক্ষ্মী—

লুটিয়ে পড়ল গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ তীর্থে। লক্ষ্মীর মন বলল—এই তো আমার সুখ-শান্তি-স্বর্গ। এই তো আমার ইহকাল আর পরকাল।

তার লাজ, মান, ভয় মুহূর্তে গেল তিরোহিত হয়ে। গোরা অনুরাগে অনুরক্তা লক্ষ্মীর আর 'আমি ভাবটি' রইল না। সব 'তুমি' হয়ে গেল।

ওদিকে এখনো বসে আছেন ঘটক বনমালী। শচীদেবীর এ সম্বন্ধে পুরোপুরি মত আছে। কিন্তু নিমাই কি বলবে! তার মতামত ছাড়া তো হবার নয়। তাই পাকাপাকি ভাবে কথা দিতে পারছেন না তিনি। তাছাড়া লক্ষ্মী যে ছিল নিমাই-এর বাল্যের খেলার সাথী। তাকে সে বিয়ে আদৌ করবে কিনা, তাও তো বোঝা যাচ্ছেনা। হয়তো এ প্রস্তাব শুনে নিমাই হেসেই দেবে উড়িয়ে।

সে যা হোক। বনমালী কে তো একটা কথা দিতে হবে।

আচ্ছা তুমি একটু বসো বাবা। আমি নিমাই-এর সঙ্গে কথা বলে আসি।

ঘরেই ছিল নিমাই। মা গিয়ে ডাকলেন, 'ওরে ও নিমু—'

আমায় ডাকলে মা ?

'ঐ বনমালী ঘটক তোর জন্যে একটা সম্বন্ধ এনেছে। মেয়ে লক্ষ্মী। তার সঙ্গে তো ছেলেবেলায় কত খেলা খেলেছিস তুই। ওকে বিয়ে করবি ?'

নিমাই একটু মুচকি হাসল।

লক্ষ্মীকে যে অনেক আগেই গ্রহণ করে বসে আছে নিমাই। এ যে পূর্ব প্রতিশ্রুত। তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল মাকে, 'তা তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই আমার ভাল। তাছাড়া লক্ষ্মী মেয়ে তো ভালই।'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শচী। আনন্দে ভরে গেল তাঁর মন। সব ভাবনা ও ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি। ত্রস্ত পায়ে চলে এলেন বনমালীর কাছে। বললেন—তুমি ব্যবস্থা কর। নিমাই-এর সম্মতি পেয়েছি।

বনমালী কর জোড়ে প্রণাম জানালেন ঈশ্বরকে। বল্লভাচার্যের ঘরে পড়ে যায় বিয়ের ব্যস্ততা। ছেলে মেয়ে উভয়ই সমান। যেমন নিমাই-এর রূপ, গুণ, যৌবন ও খ্যাতি, তেমনি লক্ষ্মীরও রূপ আছে, গুণ আছে, আছে তার নদীয়াময় খ্যাতি। এ যেন মনি আর কাঞ্চনের যোগাযোগ।

বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী লক্ষ্মী। ইনিই ছিলেন বিষ্ণুর বক্ষবিলাসিনী পরব্যোমের ঐশ্বর্য লীলায়। সেই লক্ষ্মীই এবারে আসবেন ব্রজেন্দ্র নন্দনের লীলা সঙ্গিনী হয়ে। এ কি যে সে ? ঐশ্বর্যময়ী এবারে ধরেছেন গোপী বেশ। এবারে তার গোপী ভাব।

পূর্বলীলায় লক্ষ্মীর মনে জাগল এক বাসনা।

কি ?

তিনি হবেন ব্রজ বিলাসিনী।

তা কি করে সম্ভব ? ঐশ্বর্যের যিনি অধিকারী, তিনি কেমন করে ধারণ করবেন বিরহিনীর বেশ ?

লক্ষ্মী কিছুতেই ছাড়ছেন না। এ প্রার্থনা তাঁর মঞ্জুর করতেই হবে। তিনি ব্রজরস আস্বাদন করতে চাইলেন।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

চাই সাধন ভজন। চাই স্মরণ চিন্তন।

তাই করব আমি। জপে তপে তুষ্টি সাধন করব শ্যামসুন্দরের। বিরহিনী বেশে আকুল হয়ে কাঁদব। নিবেদন করব অশ্রু-কুসুম। কান্নার আর এক নাম তো প্রেম। আমার সেই প্রেম নিবেদন করেও কি পাবনা ব্রজরাজের দর্শন?

কঠোর তপে আত্মমগ্না হলেন লক্ষ্মী। স্মরণ, চিন্তন ও মননে ধরে থাকলেন কৃষ্ণতনু। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করলেন কৃষ্ণ ভাবনায়, কৃষ্ণ সাধনায়।

কৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা আছে। চিরন্তনের প্রতিজ্ঞা?

কি সে প্রতিজ্ঞাটি?

'যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তার ভজে তৈছে।' যেমনি ভাবে যে তাঁকে ভজনা করবে, তেমনি ভাবেই পূর্ণ করবেন তিনি তার মনোস্কামনা।

পূর্ণ হল লক্ষ্মীর অন্তরাকুতি। কৃষ্ণ এলেন। কোথায়? এলেন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ বেশে। সঙ্গে আনলেন লক্ষ্মীকে। তাঁর সমস্ত ভাবটি হল বর্জিত। কিন্তু পূর্বলীলার নামটি রইল অক্ষুন্ন। এবারে আর দেবী লক্ষ্মী নয়। মানবী গৌরাঙ্গী।

এখানে এসেও লক্ষ্মীর সাধন ভজন, স্মরণ ও চিন্তনে বিন্দুচ্ছেদ পড়েনি। তাই গৌরাঙ্গ গ্রহণ করলেন তাঁকে পত্নী রূপে। অধিকার দিলেন ব্রজরস আস্বাদনের।

ব্রজেন্দ্র সুন্দরের পাশে লক্ষ্মী এসে বসল ব্রজবালা হয়ে।

শচীদেবীর সব দুঃখের হল অবসান। চিন্তা থেকে হলেন মুক্ত। ছেলে যখন ঘর বেঁধেছে, তখন আর বিশ্বরূপের মত নিশ্চয়ই মতিগতি হবে না তার।

আকাশে মিট মিট করছে তারা। সুরধুনী থেকে ভেসে আসছে মলয় অনিল। নিশীথ নির্জন। শচীদেবী শুয়েছেন অনেক্ষণ হল। চোখে ঘুম আসছেনা। ভাবছেন ছেলে বউ-এর কথা। নয়ন জুড়ান রূপ। যেমন নিমাই তেমনি লক্ষ্মী। আনন্দে মাঝে মাঝে শিহরিত হচ্ছে শচীমার সর্বাঙ্গ। চোখের পলক যেন আর পড়তে চায়না। ঐ যুগল রূপ তাঁকে রেখেছে মুগ্ধ করে।

কোথাও কিছু সাড়া নেই। নদীয়া ঘুমন্ত। নিঝুম রাত।

সহসা একটা শব্দ হল। উৎকর্ণ হয়ে তাকালেন শচীদেবী। সঙ্গে সঙ্গে তার দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। বাইরে দাঁড়িয়ে নিমাই ডাকছে—মা, ওমা, ঘুমিয়ে পড়েছ ?

উৎকণ্ঠায় বলে ওঠেন শচীদেবী—নারে ঘুমাইনি। কে, নিমু ?

—হ্যাঁ। দরজা খোল।

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলেন শচীদেবী। নিমাই ঘরে ঢুকল। সঙ্গে লক্ষ্মী।

বিস্ময়ের সুরে মা বললেন—এত রাতে যে তোমরা ?

নিমাই হেসে বললেন—না, কিছুনা। আমরা এসেছি তোমার শ্রীচরণ সেবা করতে। তুমি আমাদের বঞ্চিত করনা।

পাগল ছেলে ! এত রাত্রে নিজে তো ঘুমুবিই না, সঙ্গে আবার বউমাকেও নিয়ে এসেছিস। ছাখো, কি কাণ্ড !

তৃপ্তির সুধা সিন্ধুতে অবগাহন করেন শচীদেবী। ওরা বসল মায়ের পায়ের কাছে। দু'জনে দুটি পা ভক্তিভরে অর্চনা করতে লাগল, 'সর্ব তীর্থময়ী তুমি। তোমার সেবা করতে চাই। প্রত্যক্ষ দেবী তুমি। কোথায় যাবো আর তোমায় ফেলে দেবতার সন্ধানে ?'

শাস্ত্রাদেশ পালন করছেন নিমাই। স্ত্রীকে নিয়ে সেবা করছেন জননীর। করছেন পদ-অর্চনা।

॥ চার ॥

সুখ বড় চঞ্চল। বড় অস্থির।

অনেক দুঃখের যামিনী-যাতনার পরে একটু সুখের ছোঁয়া লেগেছিল শচীর সংসারে। এসেছিল সাচ্ছন্দ্য। এসেছিল তৃপ্তি, আনন্দ আর একটু স্বস্তি। কিন্তু বিধাতা বুঝি হেসেছিলেন তখন।

নিমাই এসে একদিন বললেন মায়ের কাছে—আমি পূর্ববঙ্গে যাব মা। সেখানে আমার পিতৃভূমি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, আমার যেন সৌভাগ্য হয় পিতৃতীর্থের রজরেণু দর্শনের।

ছ্যাত্ করে উঠল মায়ের বুকের মধ্যে। কতগুলো খ্যাপা ঢেউ যেন পড়ল এসে আছড়ে। সাহারার হাহাকারে অন্তর ভরে গেল মুহূর্তে। বউ ঘরে আসতে না আসতেই বাইরের ডাক এল নিমাইয়ের কানে।

লক্ষ্মী হতবাক। আয়ত আঁখি দুটো স্থির। অপলক। কেমন যেন শূন্য লাগে তাঁর। সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বিক্ষত বিবক্ষা লক্ষ্মী। মৌন একখানা পাষাণ মূর্তি যেন। নিরন্তর অন্তর নিঙড়ান প্রার্থনা নিবেদন করছেন আকুল সুরে—না, তুমি এখনই চলে যেওনা!

চোখ দুটি সিক্ত হল। গোপনে বস্ত্রাঞ্চলে মুছে ফেললেন তা। কেউ দেখল না। কেউ শুনল না তার অন্তরের অরুন্তুদ আর্তি।

নিমাই তার সংকল্পে অটল। পূর্ববঙ্গ যে তাঁকে ডাক দিয়েছে। কি করে থাকবেন তিনি পত্নীর অঙ্কশয়নে সুখ সোহাগে আবদ্ধ? কি করে থাকবেন মায়ের স্নেহ-প্রচ্ছায়ে? ভক্তের ডাকে ভগবান আকুল। অস্থির নিমাই। আর যেন বিলম্ব করতে পারছেন না। তাঁকে যেতেই হবে। যেতে হবে পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল

খাঁ-র দেশে। সেখানে যে অধীর কণ্ঠে কান্নার অশ্রু নিবেদন করছে ভক্তগণ।

সবলের মুখ চেয়ে শচীমা আদেশ দিলেন নিমাইকে।

কিন্তু লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী অবলা। বালিকা বধূ। কি আর বলবেন তিনি। দহনের জ্বালা নীরবে বক্ষে যাপন করলেন হাসি মুখে।

বন্ধুর পথ। জল-জঙ্গলের দেশ। বিশাল বিস্তৃত নদী। বিপুল তার তরঙ্গমালা। শচীদেবী ভাবতে পারেন না যেন। মাঝে মাঝেই উঠছেন শিঁউরে। আতঙ্কে অন্তর শুঁকিয়ে যাচ্ছে তাঁর। তবুও যেতে দিতে হল।

নিমাই নমস্কার করলেন মায়ের চরণে। লক্ষ্মীর পানে একবার তাকালেন। বক্ষে বজ্র বেধে ওরা দাঁড়িয়ে রইলেন, দাঁড়িয়ে রইলেন নিমাইয়ের পানে তাকিয়ে। মনে মনে জানালেন প্রার্থনা—হে ঈশ্বর, ওর মঙ্গল কর। যাত্রা পথ শঙ্কামুক্ত কর।

দিনের পর দিন যায়। আসে রাত। লক্ষ্মীর নয়ন-বৃন্ত থেকে ঘুম গেছে চলে। জাগর নয়নে প্রত্যক্ষ করেন আকাশের তারা। নিথর রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে বসে থাকেন মুখোমুখি।

বড় একা লাগে। দীর্ঘশ্বাসে বুকটা যেন ফেটে যেতে চায়। দুচোখ সিক্ত হয়ে যায় জলে। লক্ষ্মীর অন্তর বারে বারেই প্রশ্ন করে—আর কবে তুমি আসবে!

নানা কাজের ফাঁকে দিনটা একরকম কেটে যায়। তাও সব ভ্রান্তি। সব কাজেই বিস্মৃতি। কি করতে যে কি করে বসেন তা নিজেই বোঝেন না। কখনো কখনো উৎকর্ণ হয়ে শোনেন তাঁর অন্তরের বেদনার বাণী—এ মন্দির শূন্য।

শচীর অবস্থাও তাই। নিমাইহীন ঘর যেন কারাগারের যন্ত্রণা। কতদিন তো হয়ে গেল। অথচ ছেলের আসবার নাম নেই। ও কি কিছু বোঝে না। আর কদ্দিন ওকে ছেড়ে থাকা যায়?

ওদিকে পূর্ববঙ্গে পড়ে গেছে আনন্দের সাড়া। গৌরাঙ্গ সুন্দরের আগমন বার্তা প্রচারিত হয়ে গেছে দিকে দিকে। লোকের ভিড় ভেঙ্গে পড়ছে। আনন্দে আত্মহারা পূর্ববঙ্গবাসী। নামরসে ডুবুডুবু তারা। মৃদঙ্গের পরিপাটি চাটি এবং করতালির ঝঙ্কারে জেগে উঠেছে পূর্ববঙ্গে ওঙ্কার নাদ। পদ্মা, মেঘনার সুর-ঝঙ্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন গৌরসুন্দর কীর্তনের ওঁ-কার নাদ। কান্না ধোয়া কীর্তনের প্রবর্তন হল এই পূর্ববঙ্গ থেকেই—

"এই মতে বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত॥"

পূর্ববঙ্গে এসে নিমাই দীন-দুঃখী, আর্ত ও পতিতদের টেনে নিলেন কোলে। প্রতিষ্ঠা করলেন নানা স্থানে শিক্ষা কেন্দ্র। জীবদীক্ষার অমর মন্ত্রে উদ্বোধিত করলেন তাদের। কানে রাখলেন মুক্তির মন্ত্র। বিদ্যারসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গে এসে পেলেন প্রাণের ছোঁয়া। দিগন্তবিসারী মাঠ। উদার ব্যপ্ত আকাশ। আর উত্তাল নদ-নদীর স্পর্শ তাঁকে আত্মমগ্ন করে তুলল। নদীর অশ্রান্ত লহরির সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিলেন হরিনামের কীর্তন কণ্ঠ।

"যাহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্তন।"

নাম-যজ্ঞের রস-বন্যায় আপ্লুত হয়ে গেল—পূর্ববঙ্গ। নিমাই রবে মুখরিত হল আদিগন্ত।

এদিকে নদীয়াবাসী আকুল। আর তারা থাকতে পারছে না নিমাই হীন নদীয়ায়। শচীদেবী প্রায় পাগলিনী। লক্ষ্মী বিরহ ব্যথায় বিধুরা, উদাসিনী।

মেঘ কজ্জলিত আকাশ। আদিগন্ত অন্ধকারে অবলীন। মনে হয় ঝড় উঠবে।

অ-থির, উন্মত্তা লক্ষ্মী। তিনি শুনেছেন, নদীর দেশ পূর্ববঙ্গ। তবে কি প্রভুর কোনো—

আর ভাবতে পারেন না তিনি। ত্রস্ত পায়ে ছুটে আসেন

জননী শচীর কাছে। কম্পকণ্ঠে শুধান—মাগো, এমন মেঘে কি নদীতে তুফান ওঠে ?

শচীদেবী আশ্বস্ত করেন তাঁকে। টেনে নেন বুকের মধ্যে। লক্ষ্মী মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁপেন থরথর করে।

কখনো মা শচাদেবী পড়েন আকুল হয়ে। জ্ঞান থাকে না তাঁর। তখন পুত্র-বিরহে ব্যথিতা জননীর শিয়রে বসে লক্ষ্মী করেন তাঁর সেবা। ছেলের স্থান পুরণ করেন তিনি, পুরণ করেন নিজের অন্তর দাহকে চেপে রেখে। মুখখানা তখন যায় কালো হয়ে। সোনার অঙ্গ হয়ে যায় পাণ্ডুর। তবুও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে না লক্ষ্মীর। এ যে তার কর্তব্য। দায়িত্ব।

কিন্তু কত আর পারেন সইতে ? কি করেই বা সম্ভব হবে তা ? পরব্যোমের ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী কেমন করে সহ্য করবেন ব্রজের বিরহ-ক্রন্দন ? এ ব্রত বড় কঠোর। এ সাধন বড় কঠিন। কৃষ্ণকান্তা বলেই কি ব্রজ-রস আস্বাদন করতে পারে ?

তা পারে না। রুক্মিণী, সত্যভামাও ছিলেন কৃষ্ণ-মহিষী। তাঁরা কি পেরেছিলেন ব্রজরস আস্বাদন করতে ?

পারেন নি।

লক্ষ্মী যে বরদাত্রী, ভাগ্যদায়িনী, ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। দুঃখের দহন তাঁর সয় না। কান্নার ঘরাণা তাঁর জানা নেই। তিনি তিল তিল করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আর যেন জীবন ধরে রাখতে পারছেন না। তাই তো তিনি বিদায় নিলেন, বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দরের বিরহের সংসার থেকে। সর্প নিমিত্ত হয়ে এল, এল একটা নির্মম সত্য মৃত্যুকে নিয়ে। বিরহরূপ সর্প দংশন করল লক্ষ্মীকে। দিল তাঁকে মুক্তি।

'কাল' সাপে দংশন করল লক্ষ্মীদেবীকে। জীবনের স্পন্দন গেল থেমে। কাঁদলেন শচীদেবী। কাঁদল নদীয়াবাসী। এল সবাই এগিয়ে। এগিয়ে এল শচীদেবীর কান্নার অশ্রু মুছাতে।

কিন্তু এ কান্না কি থামবার? লক্ষ্মী বড় মনের মত বউ ছিল তাঁর। তাছাড়া নিমাই ফিরে এলে কি বলে প্রবোধ দিবেন শচীদেবী পুত্রকে? এযে অকথন কথা। কেমন করে শোনাবেন নিমাইকে—তোমার লক্ষ্মী নেই! সে আজন্মের মত বিদায় নিয়েছে তোমার সংসার থেকে!

অবুঝ মন প্রবোধ মানে না। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর এ মৃত্যু তো মৃত্যু নয়। এ যে অন্তর্ধান। বিরহের দহন থেকে মুক্ত হয়েছেন লক্ষ্মীদেবী। চলে গেছেন বৈধীর বৈকুণ্ঠে। মানে ঐশ্বর্যের কনক পুরীতে। পড়ে রয়েছে তাঁর নশ্বর দেহটি। যেন ঘুমন্ত এক অতনুর তনু।

"ঐশ্বর্য-জ্ঞানে বিধি মার্গে ভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাইঞা।"

এ হল ঈশ্বরে 'চতুর্বিধ' মুক্তি—আকাঙ্ক্ষিত সাধন। এ সাধন ঈশ্বরের শক্তি-ভিতি-ভিত্তিক। বিধি মার্গের সাধক ভগবানের শক্তি ও বিভূতির প্রতি আসক্ত। তাই তাদের কণ্ঠে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়—হে সর্ব শক্তিমান প্রভু! তোমার চরণে আমাকে দাসের দাস করে রাখ। আমি বৈকুণ্ঠে গেলেই খুশী। তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠে যাবার অধিকার দাও। শুধু দাও, দাও, ভাব। কেবল প্রাপ্তির প্রার্থনা।

কিন্তু রাগানুগার ভক্তকণ্ঠে ভিন্ন সুর। সে পথ বড় বন্ধুর। বড় পিচ্ছিল। সেখানে শুধুই বিরহের উজান-অশ্রু। কান্নার কাতরিমা।

সে পথের পথিক কারা?

গোপীকুল।

তারা বললে—না বৈকুণ্ঠ, না সিদ্ধি, না মুক্তি, কিচ্ছু চাই না তোমার কাছে। এমন কি তোমাতে লীন হবার বাসনাও নেই মোদের। তোমার ঐশ্বর্যের কনক মিনারে তুমি থাক। শক্তির খেলা খেলতে এস না আমাদের কাছে। ও সব চাইনে।

তবে কি চাই ?

মহা বিপাকে পড়লেন ভগবান।

গোপীরা বললে—চাই তোমাকে।

তব সুখ প্রীতি বাঞ্ছিতে মতি
তনু প্রাণ মন দেব
তব সুখে সুখ-তৃপ্তির সুধা
হৃদয়ে ভরিয়ে নেব।

চাই তোমার সুখ প্রীতি সাধন করতে। তোমার সুখেই আমরা সুখী। একেবারে মানবীয় ভাবে সুখ দুঃখ বিজড়িত সংসারের মধ্যে টেনে আনতে চাইল তারা তাদের প্রিয়জনটিকে। এ যে প্রিয়-প্রিয়ার সম্বন্ধ। কান্ত-কান্তার মিলন-বাঞ্ছা। দুঃখের দরিয়ায় রাগানুগার ভক্ত ভাসতে পারে। কিন্তু বৈধীয় ভক্তের দুঃখ সয় না। তাই তো লক্ষ্মীদেবী হলেন অদৃশ্য। সর্প হল নিমিত্ত।

পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই এলেন ঘরে, নদীয়া নগরে। বেজে উঠেছে শঙ্খ। মন্দিরে মন্দিরে আরত্রিকের আয়োজন। সন্ধ্যা সমাগত।

বহু অর্থ এবং বিত্ত নিয়ে এসেছেন জননী শচীদেবীর কাছে। আনত মস্তকে প্রণাম করলেন। সব তুলে দিলেন তাঁর হাতে। শচীদেবী নিথর নিশীথিনীর মত নির্বাক। গম্ভীর।

প্রভুর সে দিকে খেয়াল নেই। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যাত্রা করলেন গঙ্গাস্নানে। স্নানান্তে ফিরে এলেন ঘরে। সমাধা করলেন ভোজন পর্ব। দলে দলে ভক্ত, শিষ্যদের আগমনে প্রভু প্রীত হলেন। তাদের নিয়ে নানা কথার মধ্যে একসময়ে—

"বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥

প্রিয় পরিজনবর্গ তাই শুনে হেসে লুটোপুটি করতে লাগল। কিন্তু আসল কথাটি কারো মুখেই উচ্চারিত হল না। কি সে আসল কথাটি ?

"লক্ষ্মীর বিজয় কেহো না করে কথন ॥"

এদিকে রাত গভীর হতে চলল। যে যার যাত্রা করল ঘরের পথে। তখনো নিমাই কিছু জানেন না। পরম তৃপ্তি ভরে তাম্বুল চিবচ্ছেন। কিন্তু মা কোথায়?

"শচীদেবী অন্তরে দুঃখিত হই ঘরে।
কাছে নাহি আইলেন পুত্রের গোচরে ॥"

পুত্রই চললেন মায়ের কাছে। গিয়ে দেখলেন কি? দেখলেন বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ। বেদনায় কুঞ্চিত ভ্রু-সন্ধি। দুচোখ ভরা জল।

নিমাই বিস্ময়ে বিমূঢ়। মাকে বলতে লাগলেন মধুর কণ্ঠে,

"দুঃখিতা তোমারে মাতা! দেখি কি কারণ!"

শচীদেবী তখনো নির্বাক। নিমাইয়ের কণ্ঠে অভিমানের সুর, "বিদেশ থেকে কুশলে দেশে ফিরলুম। কোথায় তুমি কাছে আসবে, বসবে, কুশল জিজ্ঞেস করবে, তা নয়, মুখ ভার করে রয়েছো। কি হয়েছে তোমার? আমার কাছে কিছু গোপন ক'র না। যা হয়েছে সত্যি করে বল?"

ছেলের কথা শুনে অঝোরে কেঁদে ফেললেন শচীদেবী। নিমাই একটু গম্ভীর হলেম।

ক্ষণবিরতি। পরমুহূর্তেই বলতে লাগলেন, "আমি বুঝতে পেরেছি মা। নিশ্চয়ই তোমার বউমার কিছু অমঙ্গল হয়েছে?"

কে যেন বলে উঠল, "কি আর হবে! কত চেষ্টা করা হল। কিছুতেই ফিরল না আর। 'কাল' সাপ বাবা, 'কাল' সাপে কেটেছিল!"

সংবাদটি শুনে নিমাই দাঁড়িয়ে রইলেন মাথা হেঁট করে। প্রিয়া-বিরহে বিধুর অন্তর হাহাকারে ভরে গেল। বেজে উঠল অন্তর-পুলিনে বৈরাগির একতাড়া। মায়ের পানে তাকিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন নিমাই, বলতে লাগলেন আবেগ-শান্ত কণ্ঠে—

"প্রভু বোলে 'মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিব কেমনে?
এইমত কাল গতি—কেহো কারো নহে।
অতএব 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন যে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর?
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেন তায়॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতী।
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?"

লীলাময়ের লীলা কে বোঝে? মাকে আশ্বস্ত করলেন নিমাই শান্ত্বনার বারি-বর্ষণে। আবার লক্ষ্মীদেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন ব্রজরস আস্বাদনের অধিকার দিয়ে। ব্রজকুঞ্জের কোকিলের কুহু রব লক্ষ্মীদেবীর কাছে অসহ্য লেগেছিল। সইতে পারেন নি তিনি উদাস অনিলের আর্ত নিস্বন। গাভীর হাম্বা রব। মায়ের দীর্ঘশ্বাস। তাই তো তিনি চলে গেলেন—চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। নিমাই চলে এলেন মাধুর্যের লীলাস্থলে।

এবারে অন্তঃ কৃষ্ণ, বহিঃ গৌরের ভাবরস আস্বাদন। গৌর শ্যাম। গৌর কৃষ্ণ। আবার একাধারে গৌরই রাধাকৃষ্ণের লীলা বৈচিত্র্য।

॥ পাঁচ ॥

একটি নাম।

তিনটি অক্ষর।

নি-মা-ই।

এই তিনটি অক্ষর যেন তিন ভুবনের জপমালা। বৈকুণ্ঠে যিনি বিষ্ণু, গোলকে যিনি কৃষ্ণ, ব্রজে যিনি শ্যাম, এবারে নিমাই নামে নদীয়ায় তিনিই হয়েছেন অবতীর্ণ। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই তিনটি অক্ষরযুক্ত নামেই পারে শান্ত হতে। পারে সিদ্ধ হতে। তাই তো নদীয়ার নগর জীবন উদ্বেল। নাগর এসেছেন, এসেছেন নদীয়া-নাগর বিদেশে ভ্রমণ করে। মধুর স্বাদ পেলে ভোমরা যেমন ফুলের বুকে চুমু খেয়ে পড়ে থাকে, নদীয়া-কুসুম নিমাইচাঁদের চন্দ্র-চরণে তেমনি সদা-লগ্ন থাকে প্রিয়জনেরা। এমন আর হয় না। এমন আর হবে না। বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছে সবাই। চতুর্দিকে শুধু, নিমাই! নিমাই! আর নিমাই! জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এ যে অদ্বিতীয়। অতুলন।

পরিচিত পরিধি থেকে দূরে আরো দূরে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ল নিমাইয়ের নামের সৌরভ। দেশ-বিদেশ থেকে আসতে লাগল জ্ঞানীগুণী ও শাস্ত্রজ্ঞের দল। কেউ আসে নিমাইকে দেখতে। কেউ বা আসে তরুণ পণ্ডিতের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করতে। সে এক মহাসমারোহ।

তর্কে পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ কেশব কাশ্মীর এসেছেন নবদ্বীপে। দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন। ভারতের পণ্ডিত সমাজ মাথা নত করেছে তাঁর জ্ঞানের গভীরতায়। কিন্তু নবদ্বীপে এসে ঘটল অঘটন।

তরুণ পণ্ডিত নিমাই। কেশব কাশ্মীর তো দেখে মনে মনে হাসছেন। এ আর কি জানে? কতটুকু বা অর্জন করেছে?

তর্কে অবতীর্ণ হলেন কেশব কাশ্মীর নিমাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু

পরাভব ঘটল কেশব কাশ্মীরের। ভেঙ্গে দিলেন নিমাই তাঁর পাণ্ডিত্যের মিথ্যা অভিমান। অহঙ্কারের দম্ভ। পরাজিত হলেন কেশব কাশ্মীর। নিমাই রাখলেন নদীয়ার মান। আনন্দে সভাস্থ সবাই উঠল চিৎকার করে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল কেশব কাশ্মীরের মুখ, পাণ্ডুর হয়ে গেল দেহের বর্ণ। আনত মস্তকে পড়লেন এসে তিনি নিমাই পণ্ডিতের চরণ প্রান্তে।

সবই হল। কিন্তু কেশব কাশ্মীরের মনের দহন নিভল না। তিনি স্মরণ করতে লাগলেন তাঁর আরাধ্যা দেবী সারদার। একটুও ঘুম এল না। কি করে আসবে! উনিশ বছরের একটি যুবক নিমাই তাঁকে তর্ক যুদ্ধে পরাভূত করল!

হে দেবী, তুমি এ কি করলে! চোখ দুটো ভরে গেল নীরব অশ্রুতে।

সহসা চমকে উঠলেন কেশব কাশ্মীর। রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙ্গে ভেসে এল এক মধুর নারীকণ্ঠ। কে, কে তুমি?

—তোমার আরাধ্যা দেবী সারদা আমি। তুমি যার কাছে পরাজিত হয়েছ কাশ্মীর, আমি যে তারই বন্দনায় সদা রত থাকি। ঐ তো ঐশী শক্তির মূল আধার। ওঁর কাছে তোমার লজ্জা কিসের কেশব! ওঁ যে তোমাকে দেখাবে মুক্তির পথ।

রাত ভোর হল। ডেকে উঠল কাক।

কেশব কাশ্মীর ত্রস্ত পদপাতে এগিয়ে চললেন নিমাই পণ্ডিতের কাছে। তাঁর সব গ্লানি, সব বেদনার অবসান হয়েছে। নেমেছে অন্তর থেকে অহংকারের বোঝা। দম্ভের চূড়া থেকে নেমে এলেন কাশ্মীর বিনয়ের সমতলে।

নিমাই নিভৃতে নিয়ে গেলেন কেশব কাশ্মীরকে। দিলেন প্রণতির দীক্ষা—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানি না মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি॥"

তৃণ থেকে সুনীচ, তরু থেকে সহিষ্ণু ও নিজে অভিমান শূন্য হয়ে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সর্বদা কীর্তন করবে হরি নাম।

নিমাইয়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন কেশব কাশ্মীর। লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চরণ-তীর্থে।

শুধু কি তাই ?

তাঁর যেন নবজন্ম হল। পরিধানের জন্য অবশেষ রাখলেন শুধু একটি কৌপীন। হাতে নিলেন দণ্ড কমণ্ডলু। নেমে এলেন অন্তহীন অসীমের লীলা পথে। হরিনামে মুখর কাশ্মীরের অন্তর থেকে উৎসারিত হতে লাগল, আমি কোথায় পাব তারে ? মরমীয়া পথিক মনের মানুষের সন্ধানে অধীর হয়ে পথে নামলেন।

মাত্র উনিশ বছর বয়স হয়েছে নিমাই পণ্ডিতের। এর মধ্যেই ঘরে ঘরে পাতা হয়ে গেছে তাঁর সম্ভ্রমের আসন। শুধু কি তাই ? অন্তরের নিভৃতেও তাঁরই আহ্বান সঙ্গীত। নির্মল চরিত্র। অহংকার শূন্য মন। বিনয়ের অবতার। অপরূপ রূপ। এ যেন অতনুর তনু। কালো কেশদাম। অপরিপাট্য সিঁথি। পরনে পট্টবাস। কাঞ্চন দীপ্ত বক্ষ, প্রলম্বিত উপবীত। বাম করে পুঁথি। কণ্ঠে উত্তরীয়। আয়ত স্নিগ্ধ নয়ন। মুখে মাখা মাধুরী। প্রশান্ত যৌবন।

এমন ছেলের পাশে নেই লক্ষ্মী। শচীদেবীর অন্তর মরুর মত খাঁ খাঁ করে ওঠে। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা জল। ঠিক তখন তাঁর মনের নেপথ্যে ছায়ার মত সঞ্চারিত হয় আর একটি মূর্তি। অপলক শচীদেবী। তাকিয়ে থাকেন। চোখ মেলে নয়—চোখ বুজে। মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করেন সেই সুধা স্নিগ্ধ রূপ। তৃপ্তিতে ভরে যায় তাঁর চিত্ত। শূন্য মনটা মুহূর্তে যেন ভরে দেয় কে। এ যে সেই মেয়ে,

সেই বিষ্ণুপ্রিয়া। সনাতন মিশ্রের আদরের দুলালী। সে যে ভুবন ভুলান রূপ। প্রশান্তির পয়োধারা। অক্লিষ্ট কান্তি। অপ্রতিম। প্রাণহরণ লাবণ্য। ললিত লক্ষ্মী।

শচীদেবীর মনটা বড় কাঙ্গালপনা করে উঠল—যদি মেয়েটি আমার ঘরে আসত!

নিশ্চয়ই আসবে। গৌরের পাশে গৌরাঙ্গীকে যে আসতেই হবে। এবার গৌরলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়াই যে মূল কান্তা শক্তি।

রসময়ের পরে যেমন রসবল্লভার স্বরূপ, অবতারের পরে যেমন বিরাটের প্রকাশ, ঠিক তেমনি গৌরাঙ্গের পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব। বিষ্ণুপ্রিয়া যে সকল অংশের আশ্রয়। তিনি নিজেই স্বয়ং শক্তির মূল আধার। অংশিনী। রসবল্লভা। এ তো নতুন নয়। যুগ যুগ ধরে চলেছে তাঁর বিকাশ প্রকাশ। যেমন অবতার আসে, তেমনি তাঁরই সঙ্গে আসে তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। বৈকুণ্ঠে যিনি বিষ্ণুর বক্ষবিলাসিনী হয়ে ছিলেন, তিনি কে?

তিনি তো বিষ্ণুপ্রিয়ারই অংশ মাত্র। লক্ষ্মী নামে আবির্ভূতা। ঠিক তেমনি রামচন্দ্রের সীতা, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা বিষ্ণুপ্রিয়ারই অংশ শক্তি। কিন্তু তাঁকে আমরা পূর্ণ ভাবে পেলাম কোথায়?

পেলাম ব্রজধামে রাধা নামে।

রাধা হলেন গোপী শ্রেষ্ঠা। আর ব্রজনন্দন হলেন গোপী শ্রেষ্ঠ। পূর্ণতম। পূর্ণতমের সঙ্গে এলেন পূর্ণতমা। এলেন ব্রজবিলাসিনী রসশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা। সেই রাধাই আবার এলেন নদীয়ায়। এলেন গৌরসুন্দরের বিলাস মূর্তি ধারণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে।

শ্রীরাধার অন্তরে একদিন তীব্র বেদনার উদ্রেক হল। তিনি বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। কেন? তিনি ভালবাসেন নবজলধর শ্যামরূপ। কিন্তু একি দেখলেন তিনি? বিস্ময়ে বিমূঢ়া শ্রীরাধা। দেখলেন "এক যুবা, গৌর তাঁর বরণ।"

রূপে মুগ্ধা হলেন শ্রীরাধা। কিন্তু ব্যথায় বিমূঢ়া। এ গৌররূপ তাঁর অভিপ্সিত নয়। তবে কেন এ ছলনা? ক্রন্দসি শ্রীমতী গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ সমীপে। কান্না করুণ কণ্ঠে করলেন নিবেদন—ওগো, একি দেখলাম! আমার কি হল গো!

প্রশান্ত বাহু ডোরে বেঁধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—যা দেখেছ ঠিকই দেখেছ। এ জন্যে কান্না কেন? এতে তোমার নিষ্ঠা কিছু ভাঙ্গেনি প্রিয়ে।

—নিষ্ঠা ভাঙ্গেনি তো কি হয়েছে?

—যে গৌর অঙ্গ তুমি দেখেছ, সে যে আমারই দেহ।

—কেন আমার বহু বাঞ্ছিত শ্যামবরণ গৌর হল?

—এ যে রাধা ভাব সুবলিত দেহ। অঙ্গ আমার গৌর। কিন্তু অন্তর কৃষ্ণ। অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃগৌর রূপেই যে এবারের লীলা খেলা।

সেই রাধাই এবারে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে। আর শ্রীমতীর দেখা সেই গৌর যুবা এসেছেন গৌরাঙ্গ নামে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ এলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে।

॥ ছয় ॥

কে এই বিষ্ণুপ্রিয়া ?

কি তাঁর লৌকিক পরিচয় ?

বাবার নাম সনাতন মিশ্র। মায়ের নাম মহামায়া। সনাতন মিশ্রের বাবার নাম ছিল দুর্গাচরণ মিশ্র। তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মিথিলায়। পাশ্চাত্য শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ। পরে এলেন নদীয়ায়। এলেন আনন্দ নিকেতনে।

এ সংসার তো সংসার নয়—যেন লক্ষ্মী সরস্বতীর আরাধনার মন্দির। অর্থ আছে। খ্যাতি আছে। যশ আছে। আছে তার সঙ্গে শাস্ত্র, শিক্ষা এবং দীক্ষার বহুল প্রসার। সব আছে এ সংসারটায়। কিন্তু তবুও যেন কি নেই।

কি নেই ?

নেই শান্তি।

কেন ?

কালিদাস নেই।

সনাতন মিশ্র তাকাতে পারেন না তাঁর কচি বউ বিধুমুখীর পানে। ঐ শ্বেতবাস, ঐ এয়োতির চিহ্নহীন ললাট, ঐ শঙ্খ-ভাঙ্গা নগ্ন বাহু, বড় কাঁদায় সনাতনকে। কাঁদায় মহামায়াকে। তাছাড়া বয়স বা কি হয়েছিল। মাত্র একটা ছেলে হতেই বিদায় নিল কালিদাস।

কে কালিদাস ?

সনাতন মিশ্রের ছোট ভাই।

বড় স্নেহ করতেন তাঁকে। ভালবাসতেন অপরিসীম। কালিদাসের বিয়োগ-ব্যথা সনাতনকে উন্মনা করে তুলল। দুর্বল করে দিল।

স্বামীহারা বিধুমুখী। জীবনে কি আর রইল তার? রইল শুধু কান্না। অশ্রু দিয়ে তিনি তার দুঃখের কালি ধুয়ে দেন মাঝে মাঝে। বসে থাকেন বেদনাহত অন্তরে বিষাদ ক্লিষ্ট মুখে। ক্রন্দনকে নেন জীবনের সঙ্গী করে।

বিধুমুখীর পানে তাকিয়ে মহামায়ার চোখ ফেটে কান্না আসে। পরম স্নেহে টেনে আনেন তাঁকে বুকের মাঝে। সান্ত্বনার প্রশান্তিতে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন সন্তান জ্ঞানে।

সনাতনের দিন কাটে তপে জপে। বিষ্ণুর আরাধনায় জীবনের সমস্ত সময়টা করেন অতিবাহিত। মাঝে মাঝে ফেলেন দীর্ঘশ্বাস। মন্দির থেকে বেরিয়ে যান গর্ভধারিণী জননী বিজয়া দেবীর কাছে। রাখেন অন্তরের প্রণাম। ন্যায়ে, নিষ্ঠায় সনাতনের তুল্য বিরল।

স্বামীর চিন্তায়ই অনুদিন মগ্ন থাকেন মহামায়া। দেব সোপানে উত্তরণের প্রথম সোপানটি তো এই-ই। স্বামী-নিষ্ঠা থেকেই তো জন্মাবে ইষ্টে নিষ্ঠা। তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, অনুরাগ এবং আসক্তি জন্মালেই আসবে তাঁর করুণা।

মহামায়া সে দিক থেকে অবিচল। অচলা তাঁর ভক্তি এবং বিশ্বাস। প্রার্থনায় সদা সর্বদা মুখর হয়ে থাকে তাঁর অন্তর।

—হে কৃপাময়, তোমারই করুণার কণা কুড়িয়ে বেঁধেছি এ সংসার। তোমারই সেবাদাসী হয়ে বিরাজ করছি তোমার লীলাঙ্গনে। তুমি দয়া কর। আবির্ভূত হও শিশুরূপে।

ভক্তের কান্নায় ভগবান চিরদিনের কাঙ্গাল। আর পারলেন না সাড়া না দিয়ে থাকতে। দয়াময়ের দয়া হল। মহামায়া হলেন সন্তানসম্ভবা।

দিন যায়। রাত যায়। মাসের পরে মাস কাটে। উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে পরেন মহামায়া। কে আসে, কি আসে, কে তা জানে! তাছাড়া এই তো প্রথম। কষ্টই বা কি রকম? কতটুকু?

নানা চিন্তার আপ্লবে ভেসে চলেন মহামায়া। উপনীত হন এসে মাঘের মহালগ্নে।

১৪১৫ শক।

শুক্লা পঞ্চমী তিথি। মাঘ মাস।

মহামায়াদেবী ঢুকেছেন প্রসব ঘরে। ব্যথায় কাতর মহামায়া ডুকরে কাঁদছেন। সনাতন অস্থির। করছেন ঘর বার। মনে মনে ডাকছেন তার আরাধ্যতম দেবতাকে—হে বিপদ ভঞ্জন! তুমি বিপদমুক্ত কর।

মনের সুরে যে বাণী বাজে তাতে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। সনাতন নিরন্তর সেই নাম ব্রহ্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে, আকুল হয়ে, ব্যাকুল সুরে শুধু ডাকছেন, আর ডাকছেন।

যিনি দুঃখ দিয়েছেন, সন্তাপ দিয়েছেন, তিনিই আবার শুনিয়েছেন দুঃখ হরণের মন্ত্র। সন্তাপ-শান্তির বাণী। সনাতন যে সেই মহাজনকে নিয়েই মগ্ন হয়ে আছেন।

সহসা চমকে উঠলেন। তাঁর অন্দর থেকে প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বয়ে গেল এক আনন্দের ধারা। হুলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল পুরললনারা। একবার নয়, দুবার নয়, বারে বারে উত্থিত হতে লাগল হুলুধ্বনি। এসেছেন আলোর কুমারী।

ধীরে ধীরে সনাতন মিশ্র এগিয়ে গেলেন প্রসূতি-ঘরের দিকে। কিন্তু একি! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি তাকিয়ে রইলেন সদ্যজাত সন্তানটির পানে।

কি দেখছেন তিনি?

দেখছেন যেন রাত্রির গভীর বৃন্তে রজত জ্যোছনার প্রকাশ। এ যে জ্যোতির্ময়ী প্রেম প্রতিমা। মহামায়ার আঁধার ঘরে এসেছেন পরমা শক্তি। এসেছেন মানবী রূপে মূল স্বরূপা। তাই তো সনাতনের চোখের পলক পড়ে না। মনে মনে বুঝি বা

ভক্তি বিনম্র চিত্তে করেন প্রণাম। প্রণাম করেন তাঁর সদ্যাগত আদ্যাশক্তিকে।

কাঞ্চন বর্ণা শিশু। রূপের একটি ফোয়ারা। মহামায়া ব্যথায় ম্রিয়মান। কিন্তু তা বলে বিন্দু অযত্ন তিনি করতে পারচেন না শিশুর। ধীরে ধীরে তুলে নিলেন তাকে কোলে। চুম্বন করতে লাগলেন বারে বারে। ভক্তের কান্নায় তিনি যে ছোট হয়ে এসেছেন মানবীরূপে ধরা দিতে।

ওরে তোরা আনন্দ কর। শঙ্খ বাজা। হুলুধ্বনি কর। প্রদীপ জ্বেলে দে মিশ্র বাড়ির চতুর্দিকে। আজ যে দীপান্বিতার রাত। দেবী এসেছেন। মিশ্রের ঘর হয়েছে মন্দির। বাড়িটি রূপান্তরিত হয়ে গেছে তীর্থে।

সনাতন আর মহামায়ার আনন্দের সীমা নেই। এমন অপরূপ-রূপ-তনু আর কে, কবে, কোথায় দেখেছে? প্রাণ জুড়ান কান্তি। চোখ জুড়ান দীপ্তি।

গোরা আর প্রিয়া। গৌর অঙ্গের অঙ্কবিলাসিনীর গৌরাঙ্গী না হলে কি মানায়? গৌরলীলায় এবারে বিষ্ণুপ্রিয়া অনুগামিনী। তাঁর মধ্য দিয়েই এবারে ঘটবে মহাপ্রভুর মাধুর্যের মহাপ্রকাশ। ব্রজলীলার যেমন রসবল্লভা শ্রীরাধিকা না হলে অপূর্ণ, তেমনি নদীয়া লীলায়ও বিষ্ণুপ্রিয়া একান্ত অপরিহার্য।

॥ সাত ॥

কলায় কলায় চন্দ্র বাড়ে।

ফুটে বেরোয় রূপ।

আহা এ তো রূপ নয়, যেন দ্যুতি। চন্দ্র দ্যুতি।

মেয়ের বয়স আট মাস।

আট মাসেই যেন অষ্ট সিদ্ধা।

কথা বলে।

কি কথা?

অস্পষ্ট। অব্যক্ত। আধো আধো।

তবুও কত মিঠা। কত সুধা।

হাত নাড়ে। কর ধরে। আঙ্গুলে তার মুদ্রার ছাপ।

মা বলে। বা বলে। সুরেলা কণ্ঠে গায় ভাষাহীন গান।

তাকায় ইতি উতি। বাঁকা ঠোঁটে মিঠে মিঠে হাসি। চোখে ত'র চকিত পুলক। মাটিতে গড়ায় দেহ। কখনো চিত। কখনো সে বুকে হাঁটে। হাতে দেয় তালি।

ছোট ছোট পা। যেন পদ্মের পাপড়ি। ছোট ছোট আঙ্গুল। যেন দরুণের শুভ্রতা। তাই দিয়ে হাঁটে। ধীরে ধীরে হাঁটে। দুপদাপ পড়ে যায়। একটু কাঁদে। আবার উঠে দাঁড়ায়। আবার হাঁটে। আবার যায় পড়ে।

এবারে আত্মসমর্পণ। দুটি বাহু প্রসারণ। আমাকে ধর। আমাকে আশ্রয় দাও। আমার সঙ্গী হও।

কিন্তু কৈ। কেউ নেই তো। কে ধরবে?

আবার কান্না। অভিমান আর বিরহে ভেঙ্গে পড়া আর্তি।

আবার দাঁড়ায় মেয়েটি। আবার হাঁটে। বিরামহীন। বিশ্রান্তিহীন। ব্রত উদ্‌যাপনের দুর্দমনীয় নিষ্ঠা।

আট মাসে মুখে অন্ন।

নদীয়ার ঘরে ঘরে যায় আমন্ত্রণ। ধুমধাম লাগিয়ে দাও। বিশ্বময়ীর আগমন বার্তা পৌঁছে দাও বিশ্ব পরিবারে। কেউ যেন না বাদ পড়ে। ধনী থেকে দীন, সুখী থেকে দুঃখী সবাই আসবে। সবাই হাসবে। সবাই গ্রহণ করবে প্রসাদি অন্ন।

তাই করলেন সনাতন মিশ্র। ঘরে ঘরে পাঠালেন আমন্ত্রণ লিপি।

সবাই এল। তাদের সেবা করলেন সনাতন। তৃপ্তির হাসি হাসলেন। নিযে গেলেন মেয়েকে দেখাতে।

দেখো। তোমরা প্রাণ ভরে দেখো।

এ মধু ফুরোয় না। এ নেশা জুড়োয় না।

যত দেখবে, তত মেতে রবে। আকর্ষণের টানে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এর যে বিকর্ষণ নেই। বিযুক্তি নেই। বিচ্যুতি নেই। এ যে অশেষ। অনন্ত। অখণ্ড। এ যে অদ্বয়। অব্যয়। ব্রহ্মাণ্ড।

দেখ, দেখে নাও মেয়ের প্রাণ-হরণ-কান্তি। হৃদয় জুড়ানো মূর্তি। আর দেখে নাও তার আয়ত শান্ত আঁখি।

সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল মেয়েকে দেখে।

কি নাম রাখলে হে মিশ্র?

বিষ্ণুপ্রিয়া।

বাঃ, বেশ নামটি তো! বিষ্ণুর আরাধক সনাতন মেয়ের নাম রেখেছেন—'বিষ্ণুপ্রিয়া'। যেমন বিকচ কুসুমটি, তেমনি তার নাম-সুরভি।

পাড়ার লোক আর কোল ছাড়া করতে চায় না। থেকে থেকে দলে দলে লোক আসে। মেয়েকে নিয়ে করে টানাটানি। চুমু দেয়। বুকে ধরে। মহামায়ার লাগেনা ভাল। এত হানাহানি

করলে কি বাচ্চাদের শরীর থাকে? তাই তিনি কখনো রাখেন লুকিয়ে। বলেন ও ঘুমুচ্ছে। যিনি এসেছেন জীবের ঘুম ভাঙ্গাতে, তাঁরে রাখেন মহামায়া ঘুম পাড়িয়ে। এ যে বাৎসল্যলীলা।

ক্রমে বড় হয়ে ওঠেন মেয়ে। পা দেন কৈশোরের তীর্থপীঠে। নানা সাজে হন সজ্জিত। পরেন অলঙ্কার। সোনার হাতে সোনার কাঁকন। কিন্তু কার রূপ কে বাড়ায়! পরনে বর্ণালী চেলী। সখীরা আসে। প্রিয়া মিলিয়ে বসেন আনন্দের হাট। কিশোরী বেলার পসরা। পসরা মিলিয়ে বসেন কাঞ্চনা আর অমিতার সঙ্গে। প্রিয়াকে ওরা দুজনেই খুব ভালবাসে।

নানা খেলার মধ্যে একটি খেলায় প্রিয়ার বড় আসক্তি। কোনটি? গঙ্গাস্নানে। মায়ের সঙ্গে রোজ তাঁর যাওয়া চাই গঙ্গায়। করা চাই অবগাহন। এ যেন তাঁর জীবনের একটি ব্রত নিষ্ঠা। পিতামাতার প্রতি মেয়ের শ্রদ্ধার সীমা নেই। দেবজ্ঞানে ভক্তি করেন তাঁদের। ভালবাসেন অন্তর ঢেলে। সব শেষে নিভৃতে নিবেদন করেন, গৃহবিগ্রহ বিষ্ণুর চরণে তাঁর হৃদয়ের প্রেম আর ভালবাসা। এই ভালবাসার মধ্যেই লুকিয়ে থাকেন তিনি। ভালবাসা দিয়েই গড়া তাঁর তনু। মন দিয়ে ডাকেন মনের মানুষকে। উৎসর্গ করেন নিজের সব কিছু বিষ্ণুর পাদপদ্মে। সব কিছু কি? মন। মন দিলে আর কিছুই থাকে না অবশেষ। দেহ? সে তো মনেরই অনুসারী।

দেহ মন সব করিয়া অর্পণ
দেবতারে পূজে প্রিয়া—
থির আখি তার ঢল ঢল ভাব
নিবেদন করে হিয়া।

এ যে অন্তরায় ঘুচিয়ে দেবার পূজা। দেবতারে প্রিয় করে প্রিয়কেই দেবতায় রূপান্তরিত করবার সাধনা। বিষ্ণুপ্রিয়া যে একটি নতুন সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

কি সে সংবাদটি ?

ঈশ্বর স্বর্গে নেই। ঈশ্বর পাতালে নেই। ঈশ্বর তোমার আমার থেকে একটুও দূরে সরে নেই। তিনি আছেন আমাদের মত আমাদেরই ঘরে ঘরে। মনের নিভৃতে নিঃসঙ্গ হয়ে। তাকে চিনতে হবে। তাকে আবিষ্কার করতে হবে। আনতে হবে তাকে নিত্য খেলার সঙ্গী করে। দোসর করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছেন সেই হারিয়ে যাওয়া বন্ধুটির সন্ধান জানাতে। এসেছেন উন্মোচন করতে। অন্তরায় আর অন্তরাল ঘুচাতে।

বড় হয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। এসেছে তাঁর জীবনে যৌবন। কাঞ্চনে, কেয়ূরে ঝলমল করছে দেহ। কুণ্ডলে শোভিত কর্ণ। মণিহারে কণ্ঠ। পায়ে নূপুর। ললাটে সোনার টিপ। প্রিয়া ঘাটে আসেন। রোজ আসেন। গঙ্গার ঘাটে। নিজের গন্ধে নিজেই হন বিভোর। এ যেন কস্তুরী মৃগসমা। শুধু কি তাই ? বয়োবৃদ্ধির সন্ধিক্ষণে প্রিয়া উন্মনা। মগ্না।

থির জল। প্রিয়া বসেন ঘাটে। তাকিয়ে দেখেন তাঁর অবয়ব। যৌবনের বিপুল সারা অঙ্গে অঙ্গে। ঝলমল করছে ঐশ্বর্য। মগ্না হয়ে পড়েন তিনি। নিজের রূপ দেখে নিজেই বিহ্বল—নানা দ্বন্দ্বে আন্দোলিত তার প্রেম পুলিন—

> "শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
> দুহু দল বলে দ্বন্দ্বে পড়ি গেল ॥
> কবহু বাঁধক কচ কবহু বিথারি।
> কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উথারি ॥
> অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।
> উরজ উদয় থল লালিম দেল ॥
> চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
> জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥"

প্রিয়া নিজের পানে নিজে পারেন না তাকিয়ে থাকতে। চোখ

ফুটি নেমে আসে। চপল হাসি চুমু দেয় অধর প্রান্তে। লজ্জায় লাল হয়ে যায় মুখমণ্ডল। নবোদ্‌গত দেহের স্তবক প্রিয়াকে প্রলুব্ধ করে। বারে বারে আঁচল খসে পড়ে যায় বক্ষ থেকে। প্রিয়া জিহ্বা কাটে। ঠিক তখন তাঁর কানন কুন্তলা অন্তর নিকুঞ্জে কে যেন বাঁশী বাজায়। উৎকর্ণ প্রিয়া। অধিরূঢ়ভাবে বিভোর—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল॥"

শুধু কি বাঁশীই শুনেছেন? সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীওয়ালার রূপটিও প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠল মনের আর্শিতে। পেছনের দিনগুলো যেন কথা কয়ে উঠল। এসে দাঁড়ালেন শচীদেবী তাঁর সম্মুখে অভয়ের হস্ত প্রসারণ করে—দেবপ্রিয়া হও তুমি—বিষ্ণুপ্রিয়া। হও জন্ম এয়োত্রী।

প্রিয়ার প্রতি যে শচীদেবীর অশেষ টান। তাই তো একদিন বললেন মহামায়া দেবীকে, "তুমি রত্নগর্ভা পণ্ডিত গৃহিনী। বেশ মেয়েটি দিয়েছেন তোমায় ঈশ্বর। বেঁচে থাকুক মেয়ে, সুপাত্রে হোক পাত্রস্থ।"

বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছে। একবার চোখাচোখি হল শচীদেবীর সঙ্গে। মাথাটি নত হয়ে গেল লজ্জায়। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন অধোবদনে।

মহামায়াদেবী ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ মা, সেই আশীর্বাদ করুন।"

একটু একটু করে দূরে সরে গেলেন প্রিয়া। শচীদেবী অমনি বলে উঠলেন, "দেখ, দেখ, মেয়ের কি লজ্জা! আহা কি সুন্দর ভক্তিভরা মুখ!"

ইশারায় ডাকলেন শচীদেবী প্রিয়াকে। এগিয়ে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বললেন শচীদেবী, "যাবে মাগো আমাদের বাড়িতে বেড়াতে? যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে।" আনত মস্তকে নীরব সম্মতি জানালেন প্রিয়া—যাবো।

॥ আট ॥

এই তো সেই সুর-লহরা গঙ্গা।

লোকেরা একেই বলে সুরধুনী। কত কান্নার উজান অশ্রু এই সুরধুনীর' ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। কত কাহিনীর বেদনা-করুণ অধ্যায় ধ্বনিত হয়েছে একদিন। কত না বেজেছে বিরহের কাঁদনে-ধোয়া কণ্ঠ। সে সব পরের ইতিহাস।

প্রচণ্ড ভিড় জমেছে সুরধুনীর তীরে। পূণ্যার্থির দল এসেছে স্নান করতে। এসেছে গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করতে।

কিন্তু যাঁর জন্য এ পূজা, তিনি কোথায়? কোথায় সেই অন্তর তীর্থের দেবতা?

তিনি আছেন।

কোথায়?

এই পূণ্যসলিলা গঙ্গার তীরেই তাঁর বসতি।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জ্জুনকে—'হে অর্জ্জুন! যারা ভক্তিভরে আমার ভজন করে, আমার মধ্যেই স্থাপিত হয় তাদের বসতি। আমিও সে সকল ভক্তের অন্তরেই করে থাকি অবস্থান।'

এ হল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গিকার বাক্য। এ বাক্য পালন, এ সত্য পালন করবার জন্যই, ভগবান যুগে যুগে হয়ে থাকেন অবতীর্ণ।

নদীয়ার ভক্ত কণ্ঠের আকুল ক্রন্দন-আহ্বানে ভগবান এসেছেন নেমে। নেমে এসেছেন মানুষের মত। মানুষের বেশে। কিন্তু সে মানবরূপের অন্তরালে রয়েছে আর একটি দিব্য তনু। রয়েছে সেই রসবল্লভের প্রকাশ।

তাঁকে দেখবার উপায় কি?

ভক্ত হলেই তাঁকে দেখতে পায় না। ক্রম আছে। সোপান আছে। আছে স্তর। যে যতটুকু অর্জন করেছে, তাঁর ততটুকু

দর্শন। স্তরে স্তরে তাঁর নব নব প্রকাশ। এই স্তর অতিক্রম করতে না পারলে দৃষ্টির দিগন্তটা থেকে যায় আবৃত। আবৃত দৃষ্টি নিয়ে প্রিয়তমের দর্শন সুদূর পরাহত। তাঁর শক্তি ছিটেফোটা মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু শক্তিময়ের দর্শন একরকম অসম্ভব।

এই গঙ্গার কুলেই এসেছে কত নর-নারী। কত বালা বধূ। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার মত কে আছেন তাকিয়ে? কেউ না। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখেছেন তাঁর রূপময়ের রূপ। চোখে চোখ পড়েছে। মনের দিগন্তে নবরাগের উন্মেষ। যুবতীর চোখ দিয়ে দেখছেন বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর বাঞ্ছিত যুবকটিকে। প্রবল আকর্ষণ, দুর্দমনীয় টান। লজ্জা সরম, ভয়, ভীতি কিছুই যেন পারছে না প্রিয়ার দৃষ্টিকে ফেরাতে। চিত্ত-চোর চুরি করে নিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মন। অনুরাগের বাঁশী বেজে উঠেছে। গোরারূপের রং লেগেছে প্রিয়ার দেহে মনে।
কি লজ্জা! লোকে বলবে কি! এখন উপায়? এই গোরাগত প্রাণ কি করে আর বিযুক্ত করা যাবে! বাক্যহীন মন। কিন্তু ভাবের অফুরান প্রকাশ উভয়কে টেনে নেয় কাছে। আরো কাছে। আকুল উদধির মত উদ্বেল হয়ে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়—

"গোরা রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে।।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি।।
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কিনা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল।।
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণী মোহন।।

তাই বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষম জ্বালা। এ যে অকথন ব্যাধি। বারে বারে ছুটে আসেন সুরধুনীর তীরে। শচীদেবীকে দেখলেই করেন প্রণাম। নিবেদন করেন নীরবে অন্তরের প্রার্থনা, "মাগো, তোমার

ছেলে কি তাঁর চরণে আমাকে ঠাঁই দেবে না? দেবে না কি আমাকে তোমার সেবার অধিকার?"

ক্ষণ যায়। দিন যায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার সে পরম লগন আর আসে না। বড়ই অথির প্রিয়া। উন্মনা। আর যেন পারছেন না নিজেকে ধরে রাখতে কাঠিন্যের অবরোধে। অবশেষে অঘটন না ঘটে যায়। যুবতী ধরম বুঝি আর থাকে না।

শচীর ঘর অন্ধকার। লক্ষ্মীদেবী বিদায় নিয়েছেন অনেক দিন হল। নিমাই বড় একা। নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর। তা ছাড়া শচীদেবীও শোকে দুঃখে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। একটি বধূ এখন একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু নিমাইয়ের মনের মত কনে কোথায় মিলবে? এমনি এক ভাবনার অন্তরাল থেকে শচীদেবীর অন্তরে আভাসিত হয় বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ মূর্তি। সেই মেয়েটি—যার সঙ্গে রোজ শচীদেবীর দেখা হয়। বড় ভাল মেয়ে। বড় ভক্তিমতী। প্রথম দর্শনেই বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর কেড়ে নিয়েছিল শচীদেবী—

> "শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে।
> সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥"

কিন্তু এ মেয়েকে শচীদেবী কি আনতে পারবেন তাঁর ঘরে? সনাতন মিশ্র রাজ পণ্ডিত। যশোখ্যাত। ধনে ধনী। তিনি কি একটি ফকিরের হাতে দেবেন তার মেয়েকে?

অনেক ভাবলেন শচীদেবী। চিন্তা করে বের করলেন একটি সূত্র। শচীদেবী ডাকলেন একদিন ঘটক কাশী মিশ্রকে। বললেন তাঁর কাছে, "তুমি ঐ মেয়েটিকে আমার ঘরে এনে দাও। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া হয়েছে। তাকে দেখলেই আমার কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা করে।

> "দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
> বলিলেন তাঁরে বাপ! শুন এক বাণী॥
> রাজপণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছে থাকে তান।
> আমার পুত্রেরে তবে করুণ কন্যাদান॥"

কাশীনাথের কাছে শচীদেবী তাঁর মনের সব কথা বললেন খুলে। মন দিয়ে নিবিষ্ট ভাবে শুনলেন তাঁর কথা। সব করলেন অনুধাবন। তারপরে শচীদেবীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "এ জন্যে তুমি একটুও চিন্তা করো না মা। এ কাজের ভার আমি নিলাম। যেমন করেই হোক, ও মেয়েকে আমি তোমার ঘরে এনে দেবই।"

পরম প্রীত হয়ে বললেন শচীদেবী কাশীনাথকে, "তুমি এখনই যাও বাবা! হাত ধরে গিয়ে আমার নাম করে বলো পণ্ডিতকে, আমার নিমাইকে তাঁর বজায় করতেই হবে।"

শচীদেবীর আদেশ শিরোধার্য করে কাশীনাথ যাত্রা করলেন সনাতন মিশ্রের বাড়ির দিকে। মনে মনে স্মরণ করলেন ঈশ্বরকে। বললেন—যেন সফল হয়ে ফিরতে পারি।

ঐকান্তিকতার তরণী চলে বাধার তুফান ঠেলে। নিষ্ঠার পাল তুলে দিলে আর ভাবনা কি? তখন তরতর করে নৌকা এগিয়ে যায় সিদ্ধির তীর্থে।

শচীদেবীর শুভ-ইচ্ছার অঙ্কুর কাশীনাথকে দিল অমেয় শক্তি। ত্রস্ত পদবিক্ষেপে এসে পৌঁছালেন সনাতন মিশ্রের বাড়িতে—আসুন, আসুন! "কি ব্যাপার?"

কাশীনাথ বললেন, "খুব জরুরী একটা কাজ আছে।"

সনাতন বিস্ময়াবিষ্টের মত প্রশ্ন করলেন,—'আমার সঙ্গে?"

—তবে আর কার সঙ্গে!

শচীদেবীর সব কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন কাশীনাথ, "তা যা-ই বলুন মশাই, নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় সুপাত্র নবদ্বীপে নাই।"

আনন্দে বিহ্বল সনাতন এ প্রস্তাব শুনে 'হাঁ বা না' কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, "আপনি একটু বসুন। আমি আসছি।"

ছুটতে ছুটতে চলে এলেন সনাতন মিশ্র মহামায়া দেবীর কাছে—শুনছ?

মহামায়াদেবী স্বামীর কথায় সাড়া দিয়ে বললেন—কি বলছ ?

সনাতন মিশ্র আনত মথিত কণ্ঠে, গদগদ ভাবে বললেন, "এতদিনে বিধি সুপ্রসন্ন হলেন।"

মহামায়াদেবী স্বামীর মুখে সব কথা শুনলেন। নিমাইকে তিনি খুব ভালভাবেই চিনতেন। তাছাড়া তাঁর নাম নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এখন একরকম জপমালার সামিল। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি নর, কি নারী সবার মুখে ও মনে নিমাই—নিমাই—নিমাই !

—এত পবম সৌভাগ্যের কথা ! তুমি এক্ষণি আমাদের মতামত জানিয়ে দাও ঘটক ঠাকুরকে।

সনাতন মিশ্র তক্ষণই এসে বললেন কাশীনাথকে, "এ কার্য অবশ্য কর্তব্য, বহুভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় জামাতা মিলে। আপনি শচীদেবীকে গিয়ে বলবেন যে, তিনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করতে স্বীকার করে আমাকে ও আমার গোষ্ঠীকে কৃতার্থ করলেন।"

আর কিসের ভাবনা ? এবারে কাশীনাথ শুনাবেন শচীদেবীকে শুভ সংবাদ। কৃতকার্য হয়েছেন তিনি। শচীদেবীর স্বপ্ন চলেছে বাস্তবে রূপ নিতে। প্রচুর বক্‌শিস্ আর সম্মানীর লোভে কাশীনাথের আনন্দ উছলে পড়ছে যেন। দু পক্ষ থেকেই প্রচুর পাবেন তিনি।

সংবাদটি এনে রাখলেন শচীদেবীর কানে কাশীনাথ। বললেন সনাতন মিশ্রর একান্ত আগ্রহের কথা। শচীদেবী পরম প্রীত হলেন। কাশীনাথকে করলেন আশীর্বাদ। এমন আনন্দের সংবাদ পারলেন না তিনি চেপে রাখতে। নদীয়ার ঘরে ঘরে হয়ে গেল জানাজানি। সন্তোষের শয্যায় শুয়ে শচীদেবী হাসেন নিশ্চিন্তের হাসি। তাঁর চোখ থেকে টুটে গেছে তিমির তন্দ্রা। এসেছে আলোর আপ্লব। দুঃখের রাত্রি অবসানে ফুটে উঠবে প্রত্যূষের বৃন্তে একটি প্রসন্ন কুসুম। শচীদেবীর আনন্দের সীমা নেই।

॥ নয় ॥

"শুভস্য শীঘ্রম্।"

এবারে দিন দেখ। স্থির কর লগ্ন। ডাক গণকঠাকুর।

ধুমধাম পড়ে গেল। শচীদেবীর যেন বিশ্রাম নেই। গণকঠাকুর চললেন শচীদেবীর আদেশ নিয়ে সনাতন মিশ্রের বাড়িতে। পথে দেখা হয়ে গেল নিমাইয়ের সঙ্গে। বললেন গণকঠাকুর, "ওহে পণ্ডিত!"

নিমাই থমকে দাঁড়ালেন। বললেন গণকঠাকুর "জান, আমি কোথায় যাচ্ছি?"

নিমাই বললেন, "না, আমি জানি না।"

স্মিত হেসে গণকঠাকুর বললেন, "আমি যাচ্ছি সনাতন মিশ্রের বাড়িতে বিয়ের লগ্ন স্থির করতে।"

নিমাই সরল সহজভাবে জিজ্ঞেস করেন, "কার বিয়ে?"

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন গণকঠাকুর, "আর কার? তোমার!"

নিমাই পণ্ডিত গণকঠাকুরের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, আমার বিয়ে? কৈ আমি ত তার কিছু জানি না!"

আবার হাসতে লাগলেন নিমাই। এবং হাসতে হাসতেই চলে গেলেন ওখান থেকে। কিন্তু যাবার আগে আর।একটি কথাও বলে গেলেন তিনি।

কি কথা?

বললেন, "তাছাড়া এ বিয়েতে আমার মতামত নেয়নি কেউ।"

নিমাই পণ্ডিতের হাসি দেখে গণকঠাকুর প্রথমটায় ভেবেছিলেন কৌতুকপ্রিয় নিমাই বুঝি কৌতুক করছে। কিন্তু তাঁর শেষ কথাটি

তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। নানা কথা ভাবতে ভাবতে এলেন তিনি সনাতন মিশ্রের কাছে। শুকনো মুখ। চিন্তায় কুঞ্চিত ললাট। গম্ভীর কণ্ঠ।

পরম আগ্রহ ভবে সনাতন তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। কিন্তু গণকঠাকুর ধরা গলায় বলতে লাগলেন, "সবই তো প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলের সঙ্গে আলাপ কবে মনে হল, তার এ বিয়েতে মত নেই!"

চমকে উঠলেন সনাতন মিশ্র। যেন একটা বজ্র পতন হল। তা হলে এ বিয়ে কি কবে হয়! শচীদেবী বৃদ্ধা। ছেলে এখন বড় হয়েছেন। তাঁর মতই তো মত। মাযেব কথায় কি বা এসেযায়।

একেবাবে ভেঙ্গে পড়লেন সনাতন মিশ্র। মহামায়াব চোখ ফেটে নামল বেদনাব অশ্রু। বিলাপ কবতে লাগলেন সনাতন মিশ্র—

"নানা দ্রব্যে কৈনু আমি নানা অলঙ্কাব।
কাহাবে বা দোয দিব করম আমাব॥
আমি কোন অপরাধ নাহি করি।
অকাবণ আদব ছাড়িলা গৌব হবি॥—চৈঃ মঃ।

আনন্দভরা সংসাবটায় মুহূর্তে নেমে এল বেদনাব নীরবতা। কি বলে মহামায়া প্রবোধ দেবেন স্বামীকে! সব আযোজন পূর্ণ, এখন নিমাই বলছে—

"বুঝিয়া কার্যের গতি কর আচরণ!"—চৈঃ মঃ।

কি হবে এখন! এ লজ্জা আমি কোথায় বাখব! এত বড় প্রত্যাখ্যান। সনাতনের দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তিনি পাগলের মত হাহাকার কবে বলতে লাগলেন—

"হাহা গোরাচান্দ বলি ভূমিতে পড়িলা।
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধ সুখ ধন হারাইলা॥
ফুৎকার করিয়া কান্দে বোলে হরি হরি।
তোমারে না পাইলে বিশ্বম্ভর আমি মরি॥"—চৈঃ মঃ।

কার জন্য এ কান্না ? তিনি কি যে-সে ? জামাতা করে যাকে আনতে চাইছ ঘরে তিনি—

"স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর॥
সে জন কেমনে হইবে তোমার জামাতা।
শান্ত কর মন, স্মর কৃষ্ণের বারতা॥"—চৈঃ মঃ।

মহামায়ার কথায় দৃষ্টি খুলে গেল সনাতন মিশ্রের। হল আবরণ উন্মোচন। প্রভাস্বর হয়ে উঠল সনাতনের দিব্য দৃষ্টিতে সেই প্রেম-সুন্দরের স্নিগ্ধ মূর্তি। ধন্য হলেন মিশ্র। নতুন করে কান্নার দীক্ষায় দীক্ষিত হলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। নিবেদন করলেন অন্তর নিসিক্ত অশ্রুর অর্ঘ্য শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে—

"জয় পাণ্ডবের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক বাঞ্ছা বিদর্ভ নগরে॥
জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা রক্ষক মুরারি।
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী॥
তা সভারে করিল বিভা জানি তার মর্ম।
মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্য ধর্ম॥"—চৈঃ মঃ।

এত বড় আঘাত সনাতন পাননি জীবনে। এত বড় অসম্মান তিনি কি করে সইবেন। নদীয়ার মানুষকে মুখ দেখাবেন কি করে ? এ প্রত্যাখ্যানের বেদনা বড় দুঃসহ।

স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন মহামায়াদেবী,—"তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ? এতে তোমার লজ্জার কিছু নেই। বিশ্বম্ভর নিজেই এ বিয়ে করতে নারাজ। নদীয়ার মানুষ ঠিকই বুঝবে, এতে তোমার কোন দোষ নেই।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বৃদ্ধ সনাতনের দহন জুড়ায় না। কান্না ফুরায় না—

"মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতের লৈয়াছ তরিয়া ॥
জয় বিশ্বম্ভর জগজন-ত্রাণ-দাতা।
জয় সর্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা ॥
মুঞি সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ ॥"—চৈঃ মঃ।

এ যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আত্ম নিবেদন। সনাতন মিশ্রের মনের সব আবিল কান্নার অশ্রুতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর খ্যাতির সৌরভ। পাণ্ডিত্যের গরিমা। তিনি আজ রিক্ত। অনুরক্ত। প্রেম-সুন্দরের অনুরাগে অনুরঞ্জিত তাঁর অন্তর। বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকাতে পারেন না তিনি। ও যে নীরব হয়ে গেছে। নিথর হয়ে গেছে। বুঝিবা ধিক্কারে ভরে গেছে ওর জীবন। তাই তো সনাতন কাঁদেন। দিন রাত করেন বিলাপ।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি বলেন? কি তাঁর সংবাদ?

এ যে অবর্ণনীয়। অকথিত। অকথন বেয়াধি। এ রোগের ঔষধ নেই। এ বেয়াধির নিবৃত্তি নেই। যাঁকে ভুলে থাকবার জন্য এত প্রচেষ্টা, তিনি যে মনের সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছেন। কি করে বিষ্ণুপ্রিয়া বিস্মৃত হবেন তাঁকে? সদা সর্বদা যে অন্তর জপ করে চলেছে নিমাই! নিমাই! নিমাই!

"নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরানা যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥"

আহারে বিরতি। রুচি নেই মুখে। অপলক দৃষ্টি। অন্যমনস্ক ভাব। কিছু ভাল লাগে না বিষ্ণুপ্রিয়ার। মমতায় বিগলিতা প্রিয়া প্রাণ মন নিবেদন করে বসে আছেন। আর দ্বিতীয় ভাবনা কিছু নেই তাঁর মনে। যুবতী চাইছেন তাঁর যৌবন দিয়ে বাঁধতে নিমাই নামক যুবকটিকে। প্রিয়ার নিভৃত মনের এ গোপন কথা আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান। তুমি তো বোঝ প্রিয়ার মনের দহন কত দুঃসহ। তাই মিনতি মাখা কণ্ঠে নিবেদন করতে দ্বিধা নেই প্রিয়ার—

"না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিৎ তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিণে
গতি যে নাহিক মোর ॥

মনের সবটুকু ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বসে আছেন অধীর প্রতীক্ষায়।

আমি বসে রইলেম। তুমি বৈ দ্বিতীয় কিছু নেই আমাব জীবনে। তুমি ছাড়া আর কিছু জানি না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে যদি তোমার সুখ হয়, তাই করো। আমাকে ব্যথা দিয়ে যদি আনন্দ পাও, তবে সে আনন্দের বৃন্তে আমাকে ব্যথাব কুসুম করে ফুটিয়ে রেখ। আমি আমার বলতে যা কিছু সব সমর্পণ করে বসে থাকব পথের পানে তাকিয়ে।

"সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া একাকী বসে কি সব ভাবছিলেন। কোনো দিকে খেয়াল ছিল না তাঁর। কোন গহন গভীরে যেন হারিয়ে গিয়েছিল তার সজীব সত্তা। পেছন থেকে এসে ডাকলেন বিধুমুখী, "মা, বিষ্ণুপ্রিয়া!"

নির্বিকার। নিস্তরঙ্গ। কথাটি নেই তাঁর মুখে।

আবার বললেন বিধুমুখী, "কি হয়েছে তোমার? চুপটি করে বসে আছ কেন?"

মাথা নেড়ে প্রিয়া বললেন "কিছু না তো!"

"তবে? কেউ কিছু বলেছে কি?"

"না তো!"

কিছুই বললেন না প্রিয়া খুলে। বিধুমুখী চলে এলেন মহামায়ার কাছে। কিছুতেই যে তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। কি করে থাকবেন? প্রিয়াকে যে বিধুমুখী তাঁর ছেলে মাধবের চেয়েও বেশী স্নেহ করেন। সদাহাস্যময়ী আনন্দ উচ্ছলা প্রিয়া কেন নীরব? কেন তাঁর মুখে হাসি নেই? একটু অভিমানের সুরেই বললেন বিধুমুখী মহামায়াকে,—তুমি নিশ্চয়ই প্রিয়াকে কিছু বলেছ, তাই না?

বললেন শান্ত কণ্ঠে মহামায়া, "হ্যাঁ, আমি ওকে সকালে একটু বকেছিলাম। বড্ড অভিমানী মেয়ে। যা, ওকে নিয়ে আয় গে।"

—তাই বলো। আমিও তো ভাবছি, কি হলো।

বিধুমুখী চলে গেলেন প্রিয়াকে ডাকতে। কিন্তু একি! বিধুমুখী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। এতো রাগ নয়, এ যে অনুরাগ। অনুরাগের বাঁশী বেজেছে প্রিয়ার অন্তরে। তাই শুনছেন তিনি উৎকর্ণ হয়ে। কখনো হাসছেন। কখনো কাঁদছেন। কখনো বা আনন্দে যাচ্ছেন আত্মহারা হয়ে। এই তো একটু আগে বিধুমুখী দেখে গেলেন জলভরা একখানা আষাঢ়ের আকাশ। মুহূর্তে তা রূপান্তরিত হল শারদ সকালে। বিন্দুচিহ্ন নেই মালিন্যের। একটু মেঘ নেই অভিমানের। এ যেন এক পরিতৃপ্তির সিন্ধু।

বড় ভাল লাগল বিধুমুখীর। এগিয়ে এলেন প্রিয়ার কাছে। হাতখানা ধরে বললেন, "চল, মা ডাকছেন।"

সুকঠিন মানস-তপশ্চারী আজ ধ্যান সিদ্ধা। তাঁর সব অন্তরায় ঘুচে গেছে। দুঃখের তিমির ভেদ করে এসেছে

সুখের সান্ত্বনা। বিধুমুখীর পানে একটি শীতস্নাত প্রস্ফুট পদ্মের মত মুখ তুলে তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়া। মুখে মাখা লাবণ্যের ললিত সুষমা। অধরে স্মিত হাসি। এ হাসির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সবার অজানা একটি অপ্রত্যাশিত সংবাদ।

কি সে সংবাদ?

অতি মধুর। অতি সুখদায়ক। নিমাই পণ্ডিত খবর পাঠিয়েছেন।

কি খবর?

"নিমাই পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ। জননী যা স্থির করেছেন তাই নিমাইয়ের শিরোধার্য। অতএব আপনি দিন স্থির করে বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

নিমাইয়ের প্রেরিত লোক সনাতন মিশ্রকে এই খবরটি জানিয়ে গেলেন।

তাইতো বিষ্ণুপ্রিয়া একটু ইতস্তত করছিলেন মায়ের কাছে যেতে। ওঁর বুঝি লজ্জা করে না। ভক্তের অশ্রু দিয়ে লেখা হয়েছিল ভগবানের কাছে প্রেমপত্র। প্রিয়ার সে মনোলিপির জবাব দিয়েছেন গৌরসুন্দর। তাই তো এত সঙ্কোচ। এত দ্বিধা।

আনন্দের বান ডাকল দিকে দিকে। সনাতন মিশ্রের সংসারটি ঝলমল করে উঠল। কর্মব্যস্ততার ধুম পড়ে গেল। নিমাই নিজেই নির্ধারিত করলেন তাঁর বিয়ের তারিখ। সমস্ত নদীয়া নগর যেন এক সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল। এ কি যে সে বিয়ে? স্বয়ং নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে। ধনী-দীন-সবাই এলেন এগিয়ে। এগিয়ে এলেন নিমাইয়ের বিয়ের ভার বহন করতে।

ধনী ব্রাহ্মণ মুকুন্দ সঞ্জয়। নিমাইয়ের বন্ধু। তাছাড়া নিমাই টোল খুলেছিলেন তাঁর বাড়িতে। তিনি সেই সামান্য অধিকারটুকুর বলে বলিয়ান হয়ে বললেন—নিমাই পণ্ডিতের বিয়ের সমস্ত খরচা আমার। আমি আমার মনের মতন করে তাঁর বিয়ে দেব।

কিন্তু কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে করলেন প্রতিবাদ—এ বিয়ের সব ভার আমার।

নিমাই পণ্ডিতের অনুরাগী বুদ্ধিমন্ত, তাঁর দাবী বা কম কি? মুকুন্দ সঞ্জয়ের পানে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গ করে বললেন বুদ্ধিমন্ত, "এ বামুনের বিয়ে নয়। আমি রাজপুত্রের চেয়েও সমারোহ করে নিমাই পণ্ডিতের বিয়ে দেব।"

রাজপুত্র কি বলছ? এ যে রাজার রাজা। সকল ধনীর সেরা ধনী। সকল বিত্তের সেরা বিত্ত যে জমা আছে ওর কাছে। তা বেশ তো! তা বলে মুকুন্দ সঞ্জয়-এর খরচা করতে বাঁধা কি? বুদ্ধিমন্তকে এক সময়ে বলেই ফেললেন তিনি, আমিও কিছু বহন করি না?

ভালো কথা। আনন্দের ভোজে আসুন একসঙ্গে বসে খাই। নদীয়াবাসী জানুক, দেখুক গৌরসুন্দরের বিশ্ব বিদিত বিয়ের উৎসব। একসঙ্গে লেগে গেলেন দুজনেই কাজে।

দিন এল এগিয়ে, অধিবাসের দিন। শচী-গৃহে লোক যেন ধরে না। নবদ্বীপের সবাই হয়েছেন আমন্ত্রিত। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, এবং অন্যান্য জাতের প্রধানরা এলেন নিমাইয়ের উৎসবে। চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলীবৃক্ষে এবং আম্রসারে সুসজ্জিত হল নিমাই পণ্ডিতের বাড়িখানা। আলপনার নৈপুণ্যে সমস্ত বাড়িখানাকে সৌন্দর্যের অমরা করে তুলল মেয়েরা। উৎসব মুখর হয়ে উঠল শচীদেবীর বাড়িটি। বারে বারে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। ভাটগণ পাঠ করতে লাগল রায়বার।' গগন কম্পিত হুলুধ্বনির মধ্যে পণ্ডিতগণ পরিগ্রহ করলেন আসন। উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হল বেদমন্ত্র। সভায় এসে বসলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সনাতন মিশ্র লোক পাঠিয়েছেন অধিবাস করতে। নিমাই গিয়ে বসলেন স্নান করতে। এয়োগণ এগিয়ে এল। করতে লাগল নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গ মার্জনা। সর্ব অঙ্গে মাখান·

হল তৈল, আমলকী ও হরিদ্রা। গৌররূপে নারীগণ মুগ্ধা। তাদের দেহ পুলকীত। আনন্দে, শিহরণে তারা যেন গৌর-অঙ্গ প্রার্থনায় মগ্না।

শচীদেবীর জল সওয়া হয়ে গেল। হয়ে গেল ষষ্ঠী পূজা। কুলবধুরা বারে বারে হুলুধ্বনিতে উন্মুখর হতে লাগল। নিমাইয়ের অঙ্গ সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাঁর বয়স্যগণ। ললাটে দিল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোঁটা। তার মধ্যে দেওয়া হল মৃগমদবিন্দু। অলকায় আবৃত করা হল মুখমণ্ডল। নয়নে দেওয়া হল কাজল। কণ্ঠ সুশোভিত হল ফুল এবং মতির মালায়। বাহুতে রত্নবাজু। কুণ্ডল কর্ণে। পরিধানে পীত ও পট্টবস্ত্র। গায়ে পট্ট চাদর। মস্তকে মুকুট। এ যে রাজার রাজা। তাঁকে সাজিয়েও সুখ। অপূর্ব সাজে রূপময় হয়ে উঠেছেন গৌর সুন্দর। আর সময় নেই। লগ্ন প্রায় সমাগত। নিমাই উঠে দাঁড়ালেন। ভক্তি বিনম্র চিত্তে মাকে করলেন প্রদক্ষিণ। নমস্কার রাখলেন তাঁর চরণ-যুগলে। ধানে দুর্বায় শচীদেবী তাঁর প্রাণ-প্রতীম পুত্রকে করলেন আশীবাদ।

গোধুলির সমাগমে ধরণী হয়েছে লগ্না। নিমাই বয়স্বদের নিয়ে আরোহণ করলেন দোলায়। সঙ্গে সঙ্গে হুলুধ্বনি দিল পুরনারিগণ। বেজে উঠল মৃদঙ্গ, মাদল, জয়ঢাক ও বীরঢাক। নিমাই প্রথমে যাত্রা করলেন সুরধুনীর তীরে। সেখান থেকে চললেন সনাতন মিশ্রের গৃহাভিমুখে।

ওদিকে মহামায়ার বিরাম নেই। সনাতন মিশ্রের বাড়িটি যেন রূপান্তরিত হয়েছে দেবমন্দিরে। আজ দেবতা স্বয়ং অধিষ্ঠিত হবেন সেখানে। তাই তো পূজারিণী বেশে বিষ্ণুপ্রিয়া অধীর প্রতীক্ষায় কাল গুনছেন। অনন্ত রসবল্লভার সঙ্গে মিলন হবে অখণ্ড রস-স্বরূপের। বিরহের শেষ যামে ফুটে উঠবে মিলনের বৃন্তে গৌর-প্রিয়ার দিব্যতনু।

॥ দশ ॥

রজত রাত।

জ্যোছনার ঢল নেমেছে। ঘুম নেই কারো চোখে। এমন কি পশুপাখীও আজ অতন্দ্রিত।

সুরধুনী চঞ্চলা। আনন্দে নৃত্যরতা। এ রাত তো রাত নয়, যেন এক রূপসী তন্বী।

হঠাৎ গগন বিদারণ ধ্বনিতে মর্মরিত হয়ে উঠল বনকান্তার। হৃদয়ে হৃদয়ে লাগল পরিতৃপ্তির পরশ। ঘোষিত হল নিমাইয়ের আগমন বার্তা—ওরে দেখবি আয়। বর এসেছে রে, বর এসেছে! এসেছেন জগতপতি। পতিতপাবন এসেছেন উদ্ধারণের অশেষ আশ্বাস নিয়ে। এসেছেন প্রাণের সুরে হৃদয়ের বীণ বাজাতে।

সনাতন মিশ্র এলেন এগিয়ে। দাঁড়ালেন এসে দোলার সামনে। বিস্ময়ে অভিভূত মিশ্র। নিমাইয়ের রূপ-দর্শনে বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন তিনি। ভুলে :গিয়েছেন নিজের পরিচয়। এমন নয়ন লোভন রূপ জীবনে কখনো দেখেন নি তিনি। মন্থিত অন্তর। প্রশান্ত দৃষ্টি। বারে বারে একটি প্রশ্ন তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে উত্থিত হতে চাইছে—কে, কে তুমি এসে দাঁড়ালে আমার চোখের সামনে? —ভক্তিতে, ভালবাসায় নম্র হয়ে আসতে চাইছে সনাতনের মস্তক। প্রেমাশ্রুতে নয়ন দুটি বারে বারে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই যেন সনাতন মিশ্র পারছেন না তাঁকে কাঠিন্যের অবরোধে আবদ্ধ রাখতে। কি করে রাখবেন? এ যে তাঁর আবাল্যের আকাঙ্ক্ষিত রূপ। নিভৃতে বসে নিরজনে সনাতন যে রূপ দর্শনের জন্য আকুল আকুতি নিয়ে রাতের পর রাত অতিবাহিত করে দিয়েছেন, এ যে সেই সৌম্য শান্ত সুন্দর এসে ধরা দিয়েছেন স্ব-বেশে। স্ব-রূপে।

সনাতনের প্রেম-নিষ্ঠায় প্রীত হয়েছেন নদীয়া বিনোদ। তাই তো ভক্ত ভগবানে এমন সহজ মিলনটি সংঘটিত হল।

ভাবের নভে ভেসে যাচ্ছেন সনাতন। শ্লথ পদপাত। মন্থর গতি। বুঝিবা গৌরসুন্দরের চরণ রজঃ মস্তকে ধারণ করবার জন্য এগিয়ে আসছেন তিনি।

নিমাই বুঝতে পারলেন সব। জাগিয়ে দিলেন সনাতনের মনে লৌকিক ভাব। তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এলেন ভাবের রাজ্য থেকে বাস্তবের রূঢ় রুক্ষ পথে। সম্বিৎ ফিরে পেলেন সনাতন। একরকম কোলে তুলে নামিয়ে আনলেন জামাতাকে দোলা থেকে। নিমাইয়ের অঙ্গ পরশে অথির সনাতন। কি মধুর আকর্ষণ! আর যেন ও দেহ ছাড়তে ইচ্ছে করছে না তাঁর। বসে রইলেন তিনি জামাতার কাছেই তাঁকে স্পর্শ করে। বলতে লাগলেন সবাইকে ডেকে ডেকে "এই যে বর। আমি দোলা থেকে কোলে তুলে এনেছি। তোমরাও বরণ কর।"

মহামায়া এলেন। দিলেন নিমাইয়ের মস্তকে ধান্য আর দূর্বা। করলেন আশীর্বাদ। চোখে চোখ পড়তেই কেমন যেন হয়ে গেলেন মহামায়া। সব যেন এলোমেলো হয়ে গেল। হাতটা কেঁপে উঠল থর থর করে। মন যেন বলে উঠল—এ যে নর বেশে নারায়ণ!

দ্বিধান্বিত অন্তরে আশীর্বাদ পর্ব সমাধা করলেন মহামায়া। জ্বলে উঠল সমস্ত প্রদীপ। পড়ল তাতে ঘৃতের আহুতি। আরাত্রিকের বাদ্য বাজল। দেবমন্দির মুখর হল। ভক্ত-প্রাণ তাঁদের প্রাণের শিখা জ্বালিয়ে করল আত্মজনের নিরাজনা।

লগন এল। এল মুখচন্দ্রিকার শুভ লগন। এবারে চন্দ্রাননা আসবেন উদয়ভানুর নয়ন-বাণে।

বসে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বসে আছেন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলছেন :—

"তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়ায় আনিলেন সভায় ধরিয়া।"

নিয়ে আসা হল বিষ্ণুপ্রিয়াকে। প্রদক্ষিণ করলেন তিনি গৌরাঙ্গসুন্দরকে। প্রদক্ষিণ করলেন সাতবার। সপ্ত পাকে সপ্ত লোকের দেবতাকে বিষ্ণুপ্রিয়া আপন অন্তর মন্দিরে বরণ করলেন। চতুর্দিক থেকে হ'তে লাগল পুষ্প বর্ষণ। বেজে উঠল শঙ্খ। জয়ঢাকে মুখর হল নবদ্বীপ। বিষ্ণুপ্রিয়া অপূর্ব রূপে রূপমতী। শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের ভাষায়ঃ—

"গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গ ছটায় আলো করে দেশ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবালা সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥"

মালা পরালেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবতের কণ্ঠে। করলেন আত্মসমর্পণ। নিমাই প্রিয়াকে পরিয়ে দিলেন মালা। গোপীশ্রেষ্ঠার সঙ্গে এ যেন গোপীনাথের রাসলীলা।

কিন্তু প্রিয়া আনন্দের শিহরণে লজ্জাবনতা। পারছেন না চোখ মেলে তাকাতে। সখীরা উঠলেন ঝলসে, "ও কি হচ্ছে? চোখ মেলে তাকাও। শুভদৃষ্টির সময়ে চার চোখের মিলন করতে হয়।" বলরাম দাসের ভাষায়ঃ—

"ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
আড়চোখে হেরে পতি মুখ ছবি॥
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ।
কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ॥
এই যে লোভের সামগ্রী দক্ষিণে।
কারু অধিকার নাহি এই ধনে॥
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে এটী মোর বর।
এ ধন আমার কেবল আমার॥

মুখ হেঁট করি হেরিছে চরণ।
আপনারে চির করিছে অর্পণ॥
বিধি সাক্ষী করি কহিছেন মনে।
আমি ত বালিকা কহিতে জানিনে॥
মোর যত সুখ ধর তুমি করে।
তোমার যে দুঃখ দাও মোর শিরে॥
দুঃখে কিবা সুখে যেন রাখ মোরে।
ওই চন্দ্রমুখ যেন মোরে স্ফুরে॥
শত অপরাধ করিব চরণে।
ক্ষমিবা সকল তুমি নিজ গুণে॥"

শ্রীমতির অঙ্গ কান্তি যেন বিভাবরীকে করেছে আলোকিত। গৌর অঙ্গের আভায় গৌরাঙ্গী মিলে মিশে যেন এক অঙ্গ হয়ে গেছে। দুটি দেহ যেন একটি তনুতে রূপান্তরিত। বিষ্ণুপ্রিয়া আর গৌরাঙ্গ। লীলাবিলাসে এঁরা আলাদা। কিন্তু স্বরূপ ত একই।

বাসর ঘরে যাবার পথে সহসা বিষ্ণুপ্রিয়া অস্ফুটে বলে উঠলেন "উঃ!"

মুখখানা মুহূর্তে গেল বেদনায় বিবর্ণ হয়ে। দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে লেগেছে হোঁচট। রক্ত ঝরতে লাগল দরদর করে।

মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল তাঁর। তিনি ভাবলেন' "বাসর ঘরে যেতে একি অমঙ্গল!"

সন্তাপহারী সন্তাপ দূর করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষতস্থান আপন পদাঙ্গুষ্ঠির দ্বারা চেপে ধরলেন। বললেন—ও কিছু না।

অন্তর্যামী যে অন্তরে অন্তরে কথা বলেন। অন্তর দিয়ে বোঝেন অন্তরের বেদনা। বিষ্ণুপ্রিয়া এতক্ষণ মনে মনে বলছিলেন, "তুমি এ দাসীর সর্বমঙ্গলের নিদান। বিপদে বিঘ্নে, সুখে, দুঃখে তুমি বিনে আর কেই বা আমার আছে! হে প্রাণবল্লভ, আমাকে আশ্রয় দাও।"

আত্মপুরুষের অন্তর গেল গলে। বলে উঠলেন তিনি, "এই তো আমি আছি ভয় কি?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার মন থেকে দূর হল দুশ্চিন্তার খণ্ড মেঘ। বিষাদের গুণ্ঠন হল উন্মোচিত। এল আনন্দ দীপ্ত পরিতৃপ্তি। মেঘমেদুর আকাশটি পেল নির্মলতার নিঃসীম পরশ।

এবারে বাসর ঘরে বরকনের মিলন উৎসব।

গৌরাঙ্গের পাশে বসেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। চতুর্দিকে প্রিয়ার সখীরা রসালাপে মত্ত। আনন্দে আত্মহারা সবাই। চপল হয়ে উঠেছেন প্রিয়ার প্রিয় সখীরা, "বলি, হ্যাঁগো বরমশাই, আমাদের সখীটিকে পছন্দ হয়েছে তো?"

হাসির ফোয়ারায় উচ্ছল সবাই। কিন্তু নিমাই নীরব। কে যেন বলে উঠলেন,—এবারে বরমশাইকে একটু ছেড়ে দাও তোমরা। দুটো খেয়ে আসুক। ক্ষুধায় তো পেট চোঁ চোঁ করছে। খাওয়া দাওয়া সমাপণ হল গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার। আহারান্তে আবার শুরু হল সখীদের চপলতা। এ যেন বিলাসের বিলোল বারিধি। ওরা তাতে করছে অবগাহন। নিমাই নীরব। কিন্তু অলক্ষ্যে তিনি রসিকনাগর সেজে প্রেমবিলিয়ে চললেন।

"এই মত রজনী গোঙাইলা গুণমনি॥"—চৈঃ মঃ

রাত ভোর হল। ডেকে উঠল কাক। পুবের দিগন্তে পড়ল আলোর আলপনা। সখীদের মন গেল খারাপ হয়ে। তারা যেন বিলাপের সুরে বলল—না, তুমি যেও না রাত। অনন্তকাল এ বাসরে এই যুগল তনু নিয়ে আমাদের জেগে থাকতে দাও।

সবার চোখে মুখে রজনী যাপনের ক্লান্তি। কিন্তু তাও যেন বড় মধুর। এ তন্দ্রার অন্তরালে যে অনন্তরের অশেষ অমিয়। কে চায় তা থেকে মুক্ত হতে? কে চায় পরমপুরুষের স্পর্শ থেকে বিচ্যুতির বেদনা সইতে?

আজ বিদায়ের পালা।

কারো মুখে নেই হাসি। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে সমস্ত বাড়িটায়। সনাতন মিশ্রের সংসার ছেড়ে আজ চলে যাবেন সোনার প্রতিমা।

অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সমাপণ করলেন নিমাই। পতির পাতের প্রসাদ গ্রহণ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। অপরাহ্ন আগত প্রায়। সবাই ত্রস্ত ব্যস্ত। জিনিস পত্তর গুছোচ্ছে। কারো মুখে নেই রা-টি। নীরবে হয়ে যাচ্ছে সব কাজ।

তড়িৎ গতিতে সময়টা কেটে গেল। শুরু হল নৃত্যগীত। হুলুধ্বনি আর জয়ধ্বনিতে জেগে উঠল সবাই। পতিগৃহে যাবেন প্রিয়া। বিশ্বপতির সঙ্গে যাবেন বিশ্বময়ী। রসবল্লভ যে প্রেমের খেলা খেলতে এসেছেন রসবল্লভার সঙ্গে মানবীয় ভাবে।

তাই পুণ্য শ্লোক পাঠ করছেন পণ্ডিতগণ। বিপ্রগণ আর্শিবাদ করলেন যুগল মূর্তিকে।

মহামায়ার মুখখানা ফেটে পড়ছে যেন। বারে বারে তাকাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। চোখ মুছচেন থেকে থেকে। দাঁড়াতে পারছেন না স্থির হয়ে। সরে যাচ্ছেন দূরে। আবার আসছেন। আবার তাকাচ্ছেন। আবার কাঁদছেন।

বড় যত্নে লালন রক্ষণ করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। সুখের শয্যায় সোহাগের উপাধানে শুইয়ে রেখেছেন তাকে। একটু কষ্ট, একটু দুঃখ যে সইতে পারে না প্রিয়া। কত কথা, কত ভাবনা মহামায়াকে বারে বারেই কাঁদাচ্ছে। আজ শূন্য হবে মহামায়ার ঘর। কি করে সইবেন মহামায়া এ বেদন-দহন।

বিধুমুখী অশ্রুসিক্ত নয়নে দাঁড়িয়ে। বাল-বিধবা বিধুমুখীর অন্তর সঙ্গিনী ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ বিধুমুখীও একা হবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বিধুর পানে তাকিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেললেন। কান্না দিয়ে কান্না মোছাচ্ছেন বিধুমুখী। তাঁর নয়ন মোছা সিক্ত আঁচল দিয়ে প্রিয়াকে-বুকে ধরে মুছিয়ে দিচ্ছে তাঁর চোখ দুটি। এ এক করুণ দৃশ্য।

যাদব ভেঙ্গে পড়েছে কান্নায়। কাঁদছে মাধবও। শৈশবে হারিয়েছে মাধব পিতাকে। বড় দুঃখী ছেলে। দিদির আঁচল ধরে থাকত দিন রাত। আজ দিদিকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু মাধব কিছুতেই ভাবতে পারে না দিদি আর থাকবে না এ বাড়িতে। তাই তো টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার দু চোখ থেকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবারে আর পারলেন না সামলে রাখতে। থরথর করে কাঁপতে লাগল তাঁর সর্ব শরীর। দুটি হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন যাদব আর মাধবকে। মুছিয়ে দিতে লাগলেন তাদের চোখের জল।

দাস-দাসীরাও আজ উদ্ভ্রান্ত। তাদের চোখেও জল। কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই গম্ভীর। সবাই বেদনাহত। যে যার মত দাঁড়িয়ে আছে স্থানুর মত।

কান্নার সমুদ্রে জেগেছে তুফান। উতরোল হয়েছে দুঃখের কালিন্দী। সুরধুনী থেকে ভেসে আসছে বেদনার করুণ আর্তি। বনের পাখীর চোখেও আজ আর ঘুম নেই। তারাও বিলাপ করছে বেহাগ সুরে।

ধান আর দুর্বা নিয়ে এগিয়ে এলেন সনাতন মিশ্র। পেছনে ধীর পদপাতে এগিয়ে আসছেন মহামায়া। জনক-জননী আশীর্বাদ করলেন তাদের আদরের বিষ্ণুপ্রিয়াকে। টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। আশীষ চুম্বনে স্নেহের সুধা উজার করে দিলেন। অশ্রুবাদলে করে দিলেন অভিস্নাত। বিষ্ণুপ্রিয়া মা বাবার এই বেহাল অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন কণ্ঠ ছেড়ে। সনাতন ঐ কান্নার মধ্যেই মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন। না, না, অমন করে আর কাঁদিস নে মা। শুভ যাত্রায় চোখের জল ফেলতে নেই রে। চোখের জল ফেলতে নেই।

মহামায়া দেবী নির্বাক স্থানু। তার মুখে একটি কথাও হল না উচ্চারিত। যুগল মূর্তিকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। ওঁরা প্রণাম

করলেন জনক-জননীকে। সনাতন মিশ্র আবেগ উদ্বেল কণ্ঠে বলতে লাগলেন নিমাইকে "তুমি জগৎ পুজ্য বাবা! আমি আর কি বলব তোমকে। নিজগুণে আমার কন্যাকে তুমি গ্রহণ করেছ। ধন্য হয়েছি আমি। কৃতার্থ হয়েছি। আমার কন্যা পরম ভাগ্যবতী বলেই তোমার মত বর লাভে সক্ষম হল।"

নিমাই বললেন, "আপনি পূজ্যপাদ, আশীর্বাদ করুন।"

হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন মিশ্র সনাতন, "বাপ বিশ্বম্ভর, আমার এই অযোগ্য পুত্রটি তোমার হাতে দিলাম। ওর সমস্ত ভার তুমি নাও।"

নিমাই বললেন, "তাই হবে। যাদবের সব ভার আজ থেকে আমি নিলাম।"

সব কথা বার্তা শেষ হল। আর বিলম্ব করবার মত সময় নেই। বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রু ধোয়া নয়নে আবার তাকালেন। টপ টপ করে পড়তে লাগল জল। ধীর পদ সঞ্চার। আরোহন করলেন দোলায়। হুলুধ্বণিতে কান্নায় একশা হয়ে গেল সবাই। দোলা চলতে লাগল। ওঁরা তাকিয়ে রইলেন দূর দিগন্তের পানে। ধীরে ধীরে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার দোলা মিলিয়ে গেল সবুজের সীমা রেখায়।

॥ এগার ॥

নদীর এ কুল ভাঙ্গে। ও কুলে আছড়ে পড়ে হাসির তুফান। মহামায়া আর সনাতন মিশ্রের ঘুম খসে পড়েছে রাতের বৃন্ত থেকে। কান্নায় ভিজে গেছে চোখ। দীর্ঘশ্বাস আর হতাশা নিয়ে ওঁদের দিন কাটে। কিন্তু শচীদেবীর মুখে প্রসন্ন প্রভাতের একটি প্রস্ফুট পুষ্পের মত মধুর হাসি। লক্ষ্মীকে হারিয়ে শচীদেবী আর হাসেন নি। হাসতে পারেননি। কিন্তু কোটি লক্ষ্মী-বন্দিতা গোপীশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে বহুদিন পরে এই তিনি প্রথম হাসলেন। সুখের ঘরে এসেছেন সুখ-সখী। তাই তো তাঁর সব কিছুই আজ সুখের। সত্যিই আজ শচীদেবীকে পেছনের মর্মন্তুদ দিনগুলো আর পারল না ধরে রাখতে। তিনি উন্মুক্ত। আর দুঃখ সইতে পারেন না তিনি।

শচীদেবীর সংসারটি আজ ঠিক যেন একটি মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজ নিমাইয়ের ফুলশয্যা। চলতি কথায় যাকে বলে বউ-ভাত। আজ রাতে গৌরাঙ্গের সঙ্গে গৌরাঙ্গীর হবে পরম মিলন। নদীয়া বিনোদ রসাস্বাদন করবেন বিনোদিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার তুষ্টি বিধান করে। একই অঙ্গে দুই। আর দুটি অঙ্গে এক। রসবল্লভা বললে—তোমার সুখেই আমি সুখী। তোমার তুষ্টি বিধান করাই আমার পরম ব্রত।

কাজেই জীবের পক্ষে এ রাত্রিটি বরণীয়। তাই তো সখীরা সবাই এসে বসেছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পার্শ্বে। হাতে তাদের ফুলের অলঙ্কার। নবসাজে সজ্জিত করবেন আজ তাঁরা তাঁদের প্রিয় সখীকে। তারপরে পাঠাবেন বাসর ঘরে। পাঠাবেন রসময়কে আহ্লাদিত করতে।

পুলকচঞ্চলা সুরধুনী। হাওয়া বইছে ঝির ঝির করে। চতুর্দিক আমোদিত। চন্দনগন্ধা রাত। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে কোকিলের কুহুরব।

প্রিয়ার প্রধানা সখী কাঞ্চনা। বসেছেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার পার্শ্বে। আজ বনের কুসুমে মনের মত করে সাজালেন প্রিয়াকে। তার সঙ্গে মিসিয়ে দিলেন মনের মাধুরী। বাদ দিলেন না গৌর সুন্দরকেও। পুষ্প বর্ষিত হল। ফুলের বাসরে ফুলের উচ্ছাস। ঘরবার স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর। গুরুজনরা আশীর্বাদ করে গেলেন। আনন্দে সুসম্পন্ন হল গৌর প্রিয়ার মিলনোৎসব।

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই আবার এল পরোয়ানা। বেশ কাটছিল শচীদেবীর দিনগুলো। হঠাৎ তাঁর মন গেল খারাপ হয়ে। কিন্তু উপায় নেই। যেতে দিতে হবেই গৌর বিষ্ণুপ্রিয়াকে জোড় সনাতন মিশ্রের ঘরে। এ যে চিরন্তনের হিন্দু প্রথা। সনাতন মিশ্র নিজে এসেছেন বরকনেকে নিতে। কিন্তু বিদায়ের মুহূর্তে বলে ফেললেন শচীদেবী।

"আমার ঘর আবার আজ আঁধার হল মা। আমি শীগ্গিরই ফিরিয়ে আনব তোমাকে। এখন আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে মা।"

কোমলপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে ফেললেন। বাবার বাড়ি হলেও এ বিদায় বিধুর মুহূর্তে তাঁর অন্তর শচীদেবীর কথায় যেন দ্রবিভূত হয়ে গেল। মেয়ে এবং জামাতাকে নিয়ে চলে এলেন সনাতন। পথের পানে তাকিয়ে রইলেন শচীদেবী অপলক।

মন টেকেনা ঘরে। নিমাইয়ের বিয়েতে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এসেছিলেন তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে। তাঁরাও চলে গেছেন কয়েকদিন হল। এখন একদম ফাঁকা চতুর্দিক। সব কাজ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে। নিমাই নেই। বিষ্ণুপ্রিয়া নেই। নেই

অতিথি অভ্যাগত কেউ। কি আর কাজ থাকবে শচীদেবীর? গঙ্গাস্নান থেকে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যায়। নিমাই ফিরে এসেছেন এদ্দিনে। তিনি বুঝতেই পারেন না মায়ের ফিরতে এত বিলম্ব হয় কেন? অবশেষে একদিন উদ্‌ঘাটন হল সব রহস্যের। নিমাই মাকে বললেন ডেকে, "মা, রোজ তুমি তোমার বউকে দেখতে যে কুটুম বাড়িতে যাও, সেটা কিন্তু ভাল দেখায় না মা।"

অভিমানে ফেটে পড়লেন শচীদেবী, "কি করি বল? ওকে না দেখে যে থাকতে পারি নে।"

নিমাই জবাব দিলেন, "তাকে নিয়ে এলেই তো পার।"

এই একটি কথা শোনবার জন্যই শচীদেবী উৎকর্ণ হয়েছিলেন এদ্দিন।—তবে তাই হোক। তুই গিয়ে বউকে নিয়ে আয় নিমাই।

নিমাই নিয়ে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। শচীদেবীর ম্লানমুখে ফুটল হাসি। সংসারের সব দায় দায়িত্ব সব তুলে দিলেন তিনি নববধূর হাতে। গৌর-প্রিয়ার সংসার। এতো সংসার নয়, দেবতার আবাস।

সেদিন ঘটল একটি ঘটনা। নিমাই বসেছেন খেতে। কাছে বসে শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে আছেন দরজার আড়ালে। তাকিয়ে আছেন প্রভুর পানে সতৃষ্ণ নয়নে। কোনটা খেয়ে কি বলেন কে জানে? বিষ্ণুপ্রিয়ার নজর তাই নিমাইয়ের মুখ ভঙ্গিমার দিকে।

এক সময়ে বলে উঠলেন নিমাই,—এটা নিশ্চয়ই তুমি রেঁধেছ মা?

—আমি রাঁধতে যাব কেন? বউ আছে না!

—তবে বল, তুমি দেখিয়ে দিয়েছ?

শচীদেবী একটু হেসে বললেন,—নতুন বউকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হয় বৈকি!

পরম তৃপ্তিভরে নিমাই ভোজন করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার তৃপ্তির অন্ত নেই। এই তো তিনি শুধু চান। বিষ্ণুপ্রিয়া চান নিমাইয়ের

গরবে গরবিনী হতে। নিমাইয়ের রূপে রূপসী হতে। আর চান নিমাইয়ের তৃপ্তিতে পরম তৃপ্ত হতে। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজের কিছু চাহিদা নেই। সবই তুমি, তুমি, আর তুমি।

পাখী ডাকে। ভোরের পাখী।

আকাশে পড়ে আলোর আলপনা।

ঘুম ভাঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার। আর কে জাগে ?

কেউ না।

ঘর নিকোয় প্রিয়া। করেন স্নান সমাপন। বিষ্ণুমন্দিরে দেন আলপনা। ঢোকেন ফুল বাগিচায়। ঝাপি ভরে তোলেন ফুল। তারপরে যান ঘরের কাজে। ঢোকেন হেঁশেলে। সকলের সেবা সাঙ্গ করে তবে জলগ্রহণ।

পাড়ার লোকের মুখে মুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম—অমন বউ পাওয়া ভাগ্যের কাজ। যেমন দেখতে, তেমনি কাজে কর্মে। শচীদেবীর কপাল বলতে হবে। নারায়ণের পাশে যেন ঠিক নারায়ণী এসে দাঁড়িয়েছে।

সব কথা শচীদেবীর কানে আসে। গর্বে, গৌরবে তাঁর বক্ষ উঁচু হয়ে ওঠে। এসব কথা আবার শচীদেবী পারেন না বুকের মাঝে চেপে রাখতে। এসে গল্প করেন নিমাইয়ের সঙ্গে। নীরবে শোনেন নিমাই। স্মিত হাসেন। বলেন, "আমি পারি না তোমার সেবা করতে। কোনো দিন যে পারব এমন ভরসাটিও নেই। কিন্তু যে আমার এই বাসনা পুরণ করবে, আমি তার কাছে চিরটা জীবন থাকব বিকিয়ে। তার ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারব না আমি।"

আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে শচীদেবী বললেন, "লোকে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করে আনন্দ পায়। আমি আমার বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে লাভ করেছি কোটিগুণ আনন্দ।"

শুধু কাজ আর কাজ।

বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ বুজে কাজ করে যান। নিমাই সদাসর্বদা তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শচীদেবীও কাজের মধ্যেই আছেন ডুবে। কিন্তু এত কাজের মাঝে কখনো বা ছন্দ পতন ঘটতে চায় বিষ্ণুপ্রিয়ার। নিমাই একরকম সারাটা দিনই থাকেন টোল নিয়ে। কেবল খাবার সময়ে ঘরে ফেরা। সে আর কতক্ষণ? তারপরে আবার টোল। আবার সন্ধ্যা আসে। আবার রাত হয়। আবার ভোরের পাখীরা ডাকে।

কিন্তু সেদিন ঘটল অঘটন।

বিষ্ণুপ্রিয়া সহসা ডুবে গেলেন অথৈ অতলে।

তাকিয়ে রইলেন অপলক। নিমাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর অন্তর নিমাইময় হয়ে গেল। একরকম বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলেন প্রিয়া।

"জপিতে জপিতে নাম অবস করিল গো।"

নাম আর নাম। নাম করতে করতেই নামী নেমে আসেন। নাম আর নামী যে অভেদ। গৌরাঙ্গীর টানে গৌরাঙ্গ কেঁপে উঠলেন। নিষ্ঠার কাঠিন্য থেকে তিনি বাধ্য হয়ে নেমে এলেন প্রেমের পারাবারে। টোল ছেড়ে ছুটতে ছুটতে এলেন বাড়ির মধ্যে। গিয়ে দাঁড়ালেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে, "ওগো, তোমার ডাকে আমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছি। বল কি বলবে?"

প্রেম-স্নিগ্ধ দুটি চোখ তুলে নীড়ের সাবকটির মত তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়া। "তোমাকে না দেখে আমি যে আর থাকতে পারিনে। তুমি আমায় ভুলো না।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুখানা হাত ধরে তুললে নিমাই, "প্রিয়তমে, তুমি আমার দেহ, মন, প্রাণ। তুমি আমার আত্মা, আনন্দ, তৃপ্তি। তোমাকে ভুলতে পারি?"

তৃপ্তির সুধা-ধারায় অভিসিঞ্চিত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। এবারে ফিরে এল তাঁর লৌকিক জ্ঞান। লজ্জা পেলেন। মুখখানা গেল আরক্তিম হয়ে। দুটি চোখ এবারে নেমে এল পদযুগলে। নিমাই

আবার সান্ত্বনার কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "শত শত ছাত্রকে পড়াতে হয়। আমার পানে তারা তাকিয়ে থাকে। তাই তো সমস্ত দিনটাই আমাকে বাইরে থাকতে হয়। কর্তব্য কর্মে কি অবহেলা করতে আছে ?"

একটু থেমে আবার বললেন, "যাই এখন, কেমন ?"

অনুমতি প্রার্থনা করে দাঁড়িয়ে আছেন নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্মুখে। মন বলে—না, তুমি যেও না। কিন্তু তবুও দিতে হয় যেতে। এ মায়াময় স'সারে সবাই এসে যুক্ত হয় মায়ার টানে। কিন্তু অবশেষে যেতে দিতে হয় সবাইকে। কে কবে কাকে পেরেছিল ধরে রাখতে ? নানা কাজে নানা সাজে মানুষ আসে সংসারে। গতাগতি তাদের স্থিতিহীন।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল একটা। নীরবে জানালেন প্রিয়া সম্মতি। নিমাই নিক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকিয়ে রইলেন পলকহীন ছুটি নয়ন মেলে।

একটা বছর পার হয়ে গেল।

নিমাই মায়ের কাছে এসে বললেন একদিন, "মা, অনিত্য সংসার। কখন কি হবে কেউ জানে না।"

শচীদেবী চমকে উঠলেন। নিমাই এসব কি কথা বলছে! বলছেন, "বাবা আমাকে কত ভালো বাসতেন। কিন্তু আমি তাঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা, কতনা কষ্ট দিয়েছি বাবাকে। কত লোক এসে নালিশ জানাত আমার নামে বাবার কাছে। তিরস্কার করত। বাবা কত ব্যথা পেতেন। অভিমানে ছুঃখে খুঁজতে বের হতেন আমাকে। এই কাঠফাটা রোদে গায়ের পথে পথে আমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াতেন। কিন্তু আমি তো বাবার জন্য কিছু করতে পারলাম না মা!"

শচীমাতার চোখ ছুটি অশ্রু সজল হয়ে উঠল—আজ আবার এ সব কথা কেন বলছিস!

নিমাই ধরা গলায় বলে চললেন, "বড় কষ্ট হয় মা। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তবে আমি তাঁর চরণ সেবা করে প্রাণ জুড়াতাম।"

কেঁদে ফেললেন নিমাই। মায়ের প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠল পুত্রের চোখের জল দেখে। ব্যাকুল শচীমাতা আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "ওরে, শোকে দুঃখে আমি পাগল হয়ে গেছি। কেবল তোদের মুখ চেয়ে সব ভুলে আছি। নারে নিমাই, ওসব কথা তুলে আর নতুন করে তুই আমাকে ব্যাকুল করিসনে।"

নিশ্চুপ নিমাই। ক্ষণ বিরতি। কান্নার বেগটা একটু সামলে নিয়ে, বললেন নিমাই, "আমি গয়া ধামে যাবো স্থির করেছি। শুনেছি, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি হয়। তুমি আমাকে গয়াধামে যেতে অনুমতি দাও মা!"

সুরধুনীর কতগুলো খ্যাপা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল শচীদেবীর মনে। একি প্রস্তাব দিল নিমাই। এ যে বিচ্ছেদ বারতা! মহাভাবনায় পড়লেন শচীমাতা। একদিকে পিতৃকর্ম। আর এক দিকে নিমাইকে অদর্শনের বেদনা। কি করে দিন কাটবে তাঁর? নিমাইহীন-সংসার যে নিঃসীম অন্ধকারের নিঃসঙ্গ পুরী। বেদনায় আর্তিতে, অভিমানে কান্নায় শচীদেবীর দুঃখের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল, বললেন করুণ কণ্ঠে "তুই যখন গয়া ধামেই যাচ্ছিস, তখন তোর জীবন্ত জননীর নামেও একটা পিণ্ডি দিয়ে আসিস।"

বিষ্ণুপ্রিয়া অসহায়। তাঁর কথা কে শোনে? তিনি তো অবলা। একাকী থাকেন দাঁড়িয়ে। গোপনে ফেলেন চোখের জল। কি আর বলবেন তিনি? মা যাঁকে পারলেন না ফেরাতে সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুরোধে কি এসে যাবে!

দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেল। দূর দেশ। পথ দুর্গম। কত আপদ বিপদ আছে। পথে ঘাটে কে তাকে দেখবে? মায়ের

মন গেল আকুল হয়ে। তিনি অনেক ভেবে খবর পাঠালেন নিমাইয়ের মেশো আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরকে। তিনি এলেন। শচীমা বললেন চন্দ্রশেখরকে—'তুমি ওর সঙ্গে যাও। খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। কাজ শেষ হলেই আবার নিয়ে আসবে।'

চন্দ্রশেখর বললেন আমি কথা দিলেম। তাই করব।

কিছুটা আশ্বস্ত হলেন শচীদেবী। তবুও তো একজন সঙ্গী থাকবে সঙ্গে। তাছাড়া শিষ্যরাও কেউ কেউ নিশ্চয়ই যাবে!

নিমাই তৈরী। তৈরী হল তাঁর শিষ্যরা। যাত্রার প্রাক্‌লগ্নে ডাকলেন নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বললেন তাঁর কাছে একাকী, "আমি গয়াধামে যাচ্ছি বাবার পারলৌকিক কাজ করতে। শীতের মধ্যেই ফিরে আসব। তূমি সদাসর্বদা মায়ের কাছে থাকবে। তাঁর সেবা করবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া নির্বাক। তার মনের মৌন অশ্রু হয়ে গলে গলে চোখ বেয়ে পড়তে লাগল। নিমাই ব্যথা পেলেন প্রিয়ার নীরব কান্নায়। স্নেহভরে প্রিয়াকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। বলতে লাগলেন বেদনাকম্পিত কণ্ঠে, "প্রিয়ে, তোমাকে ছেড়ে আমি বেশীদিন বিদেশে থাকতে পারব না। শীগগিরই ফিরে আসব। তুমি ধৈর্য ধরে মায়ের সেবা করো।"

আর কোন কথা বললেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার দীর্ঘশ্বাস আর আঁখিধারা সম্বল করে নিমাই যাত্রা করলেন গয়াধামের উদ্দেশ্যে। শচীদেবী পেছন পেছন গঙ্গা অবধি এলেন। প্রিয়া আর পারলেন না সে দৃশ্য দু চোখ মেলে দেখতে। তিনি গিয়ে শুয়ে পড়লেন শয্যায়। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। শূন্য ঘর শূন্য মন্দির। আদিগন্ত যেন শূন্যের ঔদাসীন্যে রুক্ষ, রিক্ত। এ মরু-দহন কি কান্নার অশ্রুতে শীতল হবে না! কে যেন ডাকলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া?

জড়িমা জড়িত কণ্ঠ—কে!

উঠে দাঁড়ালেন বিষ্ণুপ্রিয়া—কে, কাঞ্চনা? আয়, ঘরে আয়।

আর চোখ ফেটে জল পড়ল টপটপ করে। কাঞ্চনা এগিয়ে এলেন। বলতে লাগলেন সান্ত্বনার সুরে, "আর কাঁদিস নে সই!

চোখ তুটো মুছে ফেল। তোর স্বামী যে ধর্মপ্রাণ। ধর্ম কার্যে তীর্থে গিয়েছেন। তুই না তাঁর ধর্মপত্নী? সহধর্মিনী? তুই যদি এমন করে কাঁদিস, তাহলে যে তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটবে প্রিয়া! চল ভাই, আমরা আজ ফুল তুলে মালা গেঁথে তাই দিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণকে সাজাই।"

শচীদেবী টলতে টলতে ফিরে এলেন ঘরে। তাঁর পানে কি করে তাকাবেন বিষ্ণুপ্রিয়া? মা যে উদ্‌ভ্রান্তা। কোন দিকে খেয়াল নেই তাঁর। পা তুটো তখনও টলছিল। তুটি মায়া মাখা চোখ তুলে শচীদেবী তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। চোখের পাতা তুটো থরথর করে কয়েকবার কেঁপে উঠল। আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ের কাছে এগিয়ে গেলেন। কাঞ্চনাও করলেন প্রিয়ার অনুসরণ।

আশ্বিন মাসে যাত্রা করেছিলেন নিমাই। গঙ্গার পার ধরে হেটে হেটে এসে উপস্থিত হলেন মন্দিরে। পথের শ্রম আর ক্লান্তি নিমাইয়ের সহ্য হল না। জ্বর এল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিষ্যদেরও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। কিন্তু এই পথে প্রান্তরে বদ্যি কোথায় মিলবে! সবার চিন্তা দূর করলেন নিমাই। বললেন—এখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক আন।

পরম আগ্রহভরে ওরা নিয়ে এল ব্রাহ্মণের চরণামৃত। পান করলেন নিমাই। ভক্তির পরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হল। ওঁদের মনের দ্বন্দ্ব দূর করলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। আপনি আচরি ধর্ম শিক্ষা দিলেন জীবকে।

কি শিক্ষা দিলেন?

ওঁদের আচার আচরণ যতই ন্যূন হোক, তবুও ওরা সাধন-সিদ্ধ। বাইরে থেকে কাউকে বিচার করতে নেই। অন্তর ত্থাখো। ত্থাখো তাঁর চোখের দীপ্তি।

পাদোদক খেয়ে রোগ মুক্ত হলেন নিমাই। জ্বর সেরে গেল একেবারে। নিমাই স্নান করলেন ব্রহ্মকুণ্ডে। কাজগুলো সেরে নিলেন। তারপরে চলে এলেন চক্রবেড়ে।

পুণ্যভূমি চক্রবেড়ে। এই সেই স্থান, যেখানে বিষ্ণুমন্দিরের অভ্যন্তরে অঙ্কিত রয়েছে ভগবানের চরণচিহ্ন পাষাণ ফলকে। পুরাণের উক্তিঃ—গয়াসুর নামে ছিলেন এক দস্যু। আচরণে তিনি দস্যু বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত। প্রবল ছিল তাঁর প্রতাপ। শক্তিতে ছিলেন অজেয়। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ হল তাঁর। দেবতারা হলেন পরাজিত। গয়াসুর তাঁদের বিতাড়িত করে দিলেন স্বর্গ থেকে।

এখন উপায়?

দেবতাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হল কাতর প্রার্থনা। তাঁরা তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা নিবেদন করলেন গিয়ে বিষ্ণুর কাছে। চাইলেন প্রতিকার। দেবতাদের কান্নায় বিষ্ণু হলেন অবতীর্ণ। যুদ্ধ হল ভক্ত গয়াসুরের সঙ্গে বিষ্ণুর। বিষ্ণু হলেন পরাজিত। ভক্তের কাছে ভগবান তো আজন্মের বন্দী. এ যে তাঁর অন্তহীন লীলার অমিয় প্রকাশ। বিষ্ণু পরাভূত হয়ে বললেন—তোমার কাছে একটি যাঁচনা আছে। কি সে যাঁচনা? আমাকে তিনটি পদক্ষেপের স্থানটুকু দাও। ভক্ত গয়াসুর মেনে নিলেন বিষ্ণুর প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু তিনটি পদক্ষেপে অধিকার করে নিলেন স্বর্গ, মর্ত এবং গয়াসুরের মস্তক। বিষ্ণুভক্ত গয়াসুর এবারে বুঝতে পারলেন ভগবানের চতুরতা। নত মস্তকে তিনি বললেন, এবারে আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর প্রভু।

কি তোমার প্রার্থনা?

এই পাদপদ্মে যারা পিণ্ড দান করবে, তারা যত পাপের অধিকারীই হোক, যেন মুক্ত হয়ে যায়।

বিষ্ণু বললেন—তথাস্তু।

ভক্ত গয়াসুরের দেহ পাষাণ হয়ে গেল। মস্তকে চিহ্নিত হয়ে রইল ভগবানের পাদপদ্ম।

এই তো সেই পাষাণ দেহ। এখানে এসে পিণ্ড দান করলে পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার মুক্তি ঘটবেই। তৃপ্ত হবেন ভক্ত গয়াসুরের আত্মা। সেই স্মরণাতীতকাল থেকে চলেছে এখানে পিণ্ড দান। এ বিশ্বাস, এ সংস্কার মানুষের যুগযুগান্তরের। এ মন্দিরটিও স্থাপন করেছিলেন গয়াসুর স্বয়ং। তাঁরই নামানুসারে এ পুণ্যতীর্থের নামকরণ হয়েছিল 'গয়া' ধাম।

নিমাই পিণ্ড দান করলেন। করলেন পিতৃকার্য সমাধা। কিন্তু তারপর? তার তো আর পর নেই! এ যে অনাদি। অনন্ত। যুগযুগান্তরের আরাধিত চরণ চিহ্ন। অপলক নিমাই। দৃষ্টি তাঁর নিষ্কম্প। নিবাত। অনিমেষ। বিপ্রগণ তখনো পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণনে মুখর :—"কাশীনাথে হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।

যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন।
তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র॥
যোগেশ্বর সভেরো দুর্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন।
যে চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্ত শয্যার অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন!"
চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।

লোমহর্ষে কম্প হৈল চরণ দর্শনে॥
সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত রহি দেখে বিপ্রগণে॥"

তন্ময় শ্রীশচীনন্দন। স্বেদে, পুলকে, অশ্রুতে, আর্তিতে নিমজ্জিত নিমাই, কাঁপছেন থর থর করে। স্বাত্তিক বিকারের অপূর্ব প্রকাশে গৌর-তনু তপোস্থির। দু নয়নে অবিরল ধারা বর্ষণ। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে চন্দ্রেরদ্যুতি। দেহটি সদাপুলক-স্পন্দিত। মুখে ভাষা নেই। কিন্তু দিব্য স্নিগ্ধ তনুতে অতনুর কান্তি সুধা যেন লাবণ্যের লহরা তুলে দেয়। দর্শকগণ বিস্ময়ে হতবাক। এ কে? এ কি? এমন মানুষ তো দেখিনি কখনো। এ নর বেশে নারায়ণ! আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না নিমাই।

অদূরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণভক্ত ঈশ্বরপুরী। তিনিও এতক্ষণ সব দেখছিলেন অপলক আঁখিতে। এ যে পরম প্রকাশ। অষ্টস্বাত্তিক বিকার। এক পা দু পা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরপুরী। ভক্ত অন্তরে যে প্রেমের বীণ বাজে, সে সুর লহমায় অপর ভক্ত কেমন করে স্থির থাকবেন? ঈশ্বরপুরী একবার নিমাইকে দেখেছিলেন নবদ্বীপে। তখন নিমাই তরুণ। চাঞ্চল্যের ঝরণা। কিন্তু ইশ্বরপুরী সেদিনই চিনে ছিলেন তাঁকে। আজ তার চেয়ে আপন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ যেন তাঁর একান্ত কাম্য একান্ত প্রার্থিত একটি দিব্যমূর্তি। এবারে ত্রস্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরপুরী। আবক্ষ আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ করলেন নিমাইকে। নাম সিদ্ধ অঙ্গসার্থে জ্ঞান ফিরে পেলেন নিমাই। তাকালেন দুটো অশ্রুস্নাত আয়ত আখি মেলে। অঝোর ধারায় দুটি গণ্ড ভেসে গেল। আকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন নিমাই,"হে প্রভু, আমাকে কৃপা কর! মুক্ত কর মোহ পাশ থেকে! ভাসতে

দাও কৃষ্ণ প্রেম-সুধা-সাগরে। আমার দ্বিতীয় আর কোনো প্রার্থনা নেই প্রভু।"

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন নিমাই। ঈশ্বরপুরীও কাঁদছেন। নিমাইয়ের নির্মল অঙ্গস্পর্শে ঈশ্বরপুরী পুলকিত, রোমাঞ্চিত, ক্রন্দনরত। ঐ প্রশান্তবক্ষে বক্ষ মিলিয়ে পুরী আড়ষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "পণ্ডিত, তুমি শান্ত হও। আমি তোমাকে চিনেছি। কি সাধ্য আমার, তোমার আদেশ লঙ্ঘন করি? একটু স্থির হও। একটু শান্ত হও। একটু পরেই আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

নির্বাক চন্দ্রশেখর। নির্বাক দর্শকবৃন্দ। চাঞ্চল্যের নির্ঝর নিমাইয়ের একি হল! সদাতর্কবিদ হাস্যোচ্ছল নিমাই কেন নিস্তরঙ্গ? কেন নীরব? কেন নিস্তব্ধ?

চন্দ্রশেখর অবস্থাটা যেন ভাল বুঝছেন না। চিন্তাড়ষ্ট তিনি। শুধু দেখছেন নিমাইয়ের ভাবান্তর।

এ দিকে শুভদিন হল আগত। এলেন ঈশ্বরপুরী। নিমাইয়ের কানে রাখলেন কৃষ্ণ-নাম। দশ মাত্রার নাম। দীক্ষাদানের পরে গুরু আলিঙ্গন করলেন শিষ্যকে। চার চোখের মিলন হল। হল অন্তর বিনিময়। কৃষ্ণ-চিন্তা, কৃষ্ণ-ভাবনায় মগ্ন নিমাই ডুবে গেলেন নামসুধার মধুরে। চন্দ্রশেখরকে বললেন, "বাড়ি ফিরে যান আপনারা। আমি বৃন্দাবনে যাব। খুঁজব আমার কৃষ্ণকে।"

বিপদে পড়লেন চন্দ্রশেখর। কি করে গিয়ে দাঁড়াবেন তিনি শচীদেবীর কাছে? কি বলে তাকে প্রবোধ দেবেন চন্দ্রশেখর। তিনি যে শচীদেবীকে কথা দিয়ে এসেছেন। নিমাইকে তিনি ভালভাবেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বাড়িতে। কিন্তু একি কথা বলছে নিমাই? আবার বললেন নিমাই, "মাকে বলবেন, তিনি যেন বৃথা দুঃখ না করেন। বলবেন, তাঁর নিমাই গেছে শ্যামসুন্দরের খোঁজে।"

অনেক অনুনয় বিনয়ে নিমাইকে ফিরিয়ে আনলেন চন্দ্রশেখর সহজে। বললেন তুমি জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত। তুমি যদি মায়ের

দুঃখ না বোঝ, তবে বল, জগতে আর কে বুঝবে? তাছাড়া আমি যে তাকে কথা দিয়ে এসেছি নিমাই। চলো, বাড়ি ফিরে চলো! কৃষ্ণ তো সর্বত্র বিরাজিত। কৃষ্ণ নেই এমন ঠাঁই কি ভুবনে আছে কোথাও? বাড়ি গিয়ে তুমি তোমার শ্যাম সুন্দরকে ভজনা করবে। তাঁর নামে লগ্ন হয়ে থাকবে। চলো ফিরে চলো নিমাই।

চন্দ্রশেখরের কাতর প্রার্থনায় নিমাইয়ের অন্তর বিগলিত হল। সম্বিত ফিরে এল তাঁর। বাড়ি ফিরে আসতে হলেন সম্মত। বাঁচলেন চন্দ্রশেখর। শচীদেবীর কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই হল।

যাত্রার দিন ধার্য হল। চন্দ্রশেখর, নিমাই ও শিষ্যরা যাত্রা করলেন গয়াধাম থেকে। আগু পিছু ওরা। মাঝখানে নিমাই। চন্দ্রশেখর সদা সতর্ক। তাঁর প্রহরী নয়ন নিমাই ছাড়া আর কিছু দেখেনা। তাঁর হৃদয় মন নিমাই ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

॥ তের ॥

"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।"

শুধু বাঁশী শুনেছে। কিন্তু কোথায় সেই বাঁশরীওয়ালা?

দেখা দাও! দেখা দাও! দেখা দাও!

অবিরাম জপ। অবিরাম কান্না।

কখনো বা রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। অন্তর থেকে নিঙড়ে নেয় অরুন্তুদ আর্তি। নয়নে ঢল নামে অশ্রুর। নিমাই তখন যেন অমবস্যার কারাকক্ষে অবরুদ্ধ এক বিক্ষুব্ধ বিবহের অমর্ষণ উদধি।

পীতবাস পরিহিত। পীতসারে চর্চিত। পিষ্টপবিমোহিত। সেই দর্শন-লোভন শ্যামসুন্দর কোথায়! কোথায় সেই কৃষ্ণ তনু! কৃষ্ণ ভানু!

চোখের পাতায় একটু ঘুম নেই। সারাটা রাতই জেগে বসে থাকেন। আকুল কবা কণ্ঠের ক্রন্দনে বিশ্রুত হয় সুধা-সিন্ধু। বেদনা বিধুর নিমাই। বারে বারে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলতে বলতে কেমন যেন নীরব হয়ে যান। তখন বুঝি নিমাই নিজেই কৃষ্ণ হয়ে যান। দর্শনে কৃষ্ণ-রূপ। পর্শনে কৃষ্ণ-তনু। চিন্তনে কৃষ্ণ-কথন। তখন আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই কেউ। ধ্যাণী আর ধ্যেয় মিলেমিশে একাকার। নিমাই তখন নিথর। নিস্পন্দ। নীরব।

পরম বৈষ্ণব শ্রীমান পণ্ডিত শুধালেন নিমাইকে, "কি হয়েছে তোমার বিশ্বম্ভর?"

কিছু জবাব দিতে পারেন না নিমাই। তাকিয়ে থাকেন শিশুর মত।

নৈয়ায়িকগণ পরম খুশী। শাস্ত্রজ্ঞ নিমাইয়ের সামনে মুখ খুলবার উপায় ছিল না। কিন্তু নিমাই এখন নিস্তরঙ্গ। শীতের

শান্ত নদীটি যেন। কোনো প্রতিবাদ নেই। উচ্ছলতা নেই। নেই তর্কের স্পৃহা। কৃষ্ণনামে বিভোর নিমাই। কৃষ্ণধ্যানে তন্ময়। খসে পড়েছে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের উত্তরীয়। কৌতুক বিদ্রুপ এখন দীনতার অশ্রুতে বিগলিত করুণা।

গয়া থেকে নিমাইয়ের প্রত্যাবর্তনের সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল। সুহৃদ, শিষ্য, স্বজন, প্রিয়জনেরা এলেন সবাই ছুটে। কিন্তু সকলের চোখেই বিস্ময়। কৈ, সে নিমাই কোথায়? এ যে অন্য নিমাই? নিমাই কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছেন। ঈশ্বরায়িত হয়ে গিয়েছেন। আত্মসত্য, আত্মজ্যোতি, আত্মদীপ্তি আত্মতন্নুভায় নিমাই নিরবধি দর্শন করেছেন আত্মমূর্তি। তাই অনিবার তাঁর মুখে স্ফুরিত হচ্ছে কৃষ্ণ-কথন। কৃষ্ণ কীর্তন।

ওদিকে শচীদেবী বসে আছেন নিমাইয়ের খাবার নিয়ে। কিন্তু নিমাই গয়ার গল্প নিয়ে মত্ত। অবশেষে মা ডাকলেন, "ওরে নিমাই, জায়গা করেছি। চল দুটো খেয়ে নিবি। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধটুকুও নেই তোর? কি হয়েছে তোর বাবা?"

শচীদেবীর কান্না এল। একবারটি প্রাণখুলে মা বলেও ডাকটি দেয়নি নিমাই। মায়ের ব্যথা নিমাইয়ের অন্তরকে কাঁদাল। বললেন তিনি, "দুঃখ পেয়োনা মা। পাঁচজন ছিল বলেই যেতে পারিনি ভেতরে।"

বলতে বলতেই অন্যভাব এসে গেল যেন. "আহা, কি দেখলাম মা।"

"বেশ হয়েছে। চল তো আগে খেয়ে নে তো।" "আচ্ছ চল যাই। আগে খেতে দেবে। তারপরে সব কথা বলব মা।"

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু আগেকার মত আর কথাবার্ত নেই নিমাইয়ের। শচীদেবীর চিন্তার চ্ছেদ নেই। দিনরাত প্রার্থনা করেন ঈশ্বর সমীপে নিমাইয়ের জন্য—ওকে ভাল করে দাও ওকে ওর স্বভাবে ফিরিয়ে দাও।

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥"

গভীর রাত। নবদ্বীপ ঘুমন্ত। সহসা বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠে শচীদেবী চমকে উঠলেন, "মা, মাগো, শীগ্‌গির ওঠ!"

"কে গো, বউ মা?"

—দেখে যাও, ও যেন কেমন করছে।

শচীদেবী ছুটে এলেন। নিমাই বিছানা থেকে নেমে বসে আছেন মেঝেতে। কোনো দিকে খেয়াল নেই। অবিরাম কান্নায় আকুল হয়ে গিয়েছেন। শচীদেবী উৎকণ্ঠাভরা কণ্ঠে শুধালেন, "কি হয়েছে বাবা? কাঁদছ কেন?"

নিমাই মাকে আশ্বস্ত করলেন, "স্থির হও মা।"

—তুই স্থির হলেই তো আমি স্থির হতে পারি বাবা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকা বধূর মত এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মুখে তার কথাটি নেই। কি আর বলবেন? এ দৃষ্টি, এ প্রেম, এ ভালবাসা কার জন্য? এ আসক্তির দুঃসহ পীড়ন তাকে কেন্দ্র করে তো নয়! কোনো দিকে যেন আর খেয়ালই নেই তাঁর। গয়া থেকে এসেছেন অন্য মানুষ হয়ে।

অশ্রু স্তিমিত নয়নে অসহায়ের মত মায়ের পানে তাকিয়ে নিমাই বলতে লাগলেন, "একটি স্বপ্ন দেখলাম মা। দেখলাম শ্যামসুন্দর এসেছেন। আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছেন বাঁশী। কি রূপ! গলে বনমালা। মা, এইতো আমার কৃষ্ণ। আমার প্রাণধন। আমার অন্তর সুন্দর। তাকে যে আমি ভুলতে পারিনা মা।"

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন নিমাই। মা ছেলের মাথায় ও পীঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—আজ একটু ঘুমাও বাবা। কাল আবার শুনব তোমার মুখে কৃষ্ণ-কথন। অনেক রাত হয়ে গেছে। বউমার যে কষ্ট হচ্ছে বাবা।

সেদিনকার মত মায়ের কথায় শুয়ে পড়লেন নিমাই। বিষ্ণুপ্রিয়া নীরব দর্শক। এমনি করে রাতের পর রাত নিমাইয়ের শিয়রে তিনি একনিষ্ঠ একটি অতন্দ্র প্রহরীর মত জেগে থাকেন। বিলাপ, কান্না, আর্তি—কত কিছুর সঙ্গে তাঁর নতুন নতুন পরিচয়। তিনিও অবশেষে নীরবে চোখ মোছেন। অন্তরের অব্যক্ত বেদনা দীর্ঘশ্বাসে শূন্যে মিলিয়ে দিতে চান। বিষ্ণুপ্রিয়া কি বলবেন? কিছু বলার নেই তাঁর। জ্ঞানে, গুণে, পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপের শিরমণি নিমাই। তাঁর গলে পরিয়েছেন তিনি বরমাল্য। এ ত পরম গৌরবের। পরম আনন্দের। কিন্তু একি হল? কোথায় হারিয়ে গেলেন সেই মানুষটি, সুরধুনীর তীরে যাঁর সঙ্গে চার চোখের মিলন হয়েছিল?

দিনের বেলায় ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বরের বাড়ীতে আসর বসে। মিলিত হন এসে ভক্তবৃন্দ। কৃষ্ণ-কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে অঙ্গন। নাম শুনতে শুনতে নিমাই হারিয়ে ফেলেন বাহ্যজ্ঞান। শিষ্যদের আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "ভাই সব, আমাকে দিয়ে তোমাদের আর কোনো আশা নেই। যা হবার হয়েছে। কৃষ্ণ ভিন্ন আমি যে আর কোন পাঠ দেখছি না। কৃষ্ণ ছাড়া সবই যে মিথ্যা। একমাত্র কৃষ্ণই সকল পাঠের সার সত্য। যদি এতে তোমাদের মন তুষ্ট না হয়, তবে অন্য গুরুর স্মরণ লও ভাই।"

এখন আর টোলে বসে পড়াতে পারেন না ছেলেদের। প্রসঙ্গান্তর হয়ে যায়। সব কথার সেরা কথা, কৃষ্ণ কথা। যেখান থেকেই শুরু করেন না কেন, যেতে যেতে সেই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন। আকুল কণ্ঠে বলতে থাকেন ছাত্রদের—তোমরাও আমার কৃষ্ণকে ভালবাস। তাঁর স্মরণ লও। বলো, কৃষ্ণ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ।

আহা কি মধুক্ষরা কণ্ঠ! কি মন্ত্রমুগ্ধ আবেশ। ছেলেরা যেন কোথায় যায় অতলায়িত হয়ে। অবিরাম হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে কৃষ্ণনাম। এ নেশা জুড়ায় না। এ

মধু ফুরায় না। এ নামামৃত যত পান করবে, তত মেতে রবে। কৃষ্ণ-সায়রে ডুবে মরতেও সুখ।

অধ্যক্ষ নিমাই, পণ্ডিত নিমাই আর নেই। এ আর এক নিমাই। এ আর এক স্বতন্ত্র পুরুষ।

টোলের দুয়ার ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে এল। তর্কের তীর্থ নবদ্বীপ ভাসিয়ে নিয়ে গেল কৃষ্ণনাম-তরঙ্গে। ভক্তদের কীর্তন কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল কৃষ্ণনাম।

কিন্তু শচীদেবী সইতে পারছে না নিমাইয়ের এ ভাবান্তর। বিষ্ণুপ্রিয়া বিমূঢ়া। এ কি হল! কি মানুষ কি হয়ে গেল। ছায়া ছবির মত শচীদেবীর চোখের সামনে প্রভাস্বর হয়ে ওঠে নিমাইয়ের জীবনের অতীত অধ্যায়গুলো। বাল্যে নিমাই দুষ্ট একটি মিষ্টি ছেলে। তারপর এল চাঞ্চল্য। এল দুরন্তপনা। কৈশোরে কিশোব কিশোরীদের সঙ্গে চলে লীলা বিলাস। যৌবনে নিমাই প্রখ্যাত পণ্ডিত। নদীয়াশিরমণি। পরিপূর্ণ একজন গৃহী। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সে দিনগুলি? ছেলের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মা। ভেঙ্গে পড়েন কান্নায়। একি সর্বনাশ হল!

বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীকে বললেন, "মা ওকে ভাল কবরেজ দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে শচীদেবী কেঁদে ফেললেন।

আপনজন দেখলে নিমাই তাঁর গলা ধরে রোদন করতে থাকেন। কথাটি নেই মুখে। যদি কিছু বলেন তো, "কৃষ্ণ কোথায়, তুমি কি তাঁকে দেখেছ? তিনি কি আমাকে দেখা দেবেন?"

ব্যাকুল কণ্ঠে শচীদেবী শুধাল, "ওরে তুই এমন হলি কেন বাপ?"

নত মস্তকে নিমাই জবাব দেন মায়ের কথার, "কেন যে এমন হলেম, কিছু বুঝি না মা। কৃষ্ণছাড়া আর যে কিছুই আমার ভাল লাগে না। মন প্রবোধ মানে না। বল মা, এখন আমি কি করি?"

কখনও বলেন, "মা! আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।"

কখনও বা শচীদেবীর গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলেন "এই তো আমার মা যশোদা।"

শচীদেবীর অনেক বয়স হয়েছে। প্রায় ৬৭ বছর। তুর্ভাগ্যের ঝড়ে বিধ্বস্ত শচীদেবী। স্বামী গেছেন। বড় ছেলেটার সন্ধান নেই। কত সন্তান-সন্ততি পর পর বিদায় নিয়েছে। সব হারিয়ে তাঁর নিমাই। তার কানে বেজে উঠল অবশেষে কালার বাঁশী? বিলাপে আর্তিতে ভেঙ্গে পড়েন শচীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মেঃ—

"অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহুক বিশ্বম্ভর॥"

আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদন করেছেন ঈশ্বরের পাদপদ্মে। তাইতো এ কাতর প্রার্থনা।

বিশ্বম্ভরের তাঁর মুখ চেয়ে সব তুঃখের আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন শচীদেবী। কত আশা। কত আনন্দ শচীদেবীর মনে। নিমাই পণ্ডিত হয়েছে। নবদ্বীপের গুণী জ্ঞাণীদের শ্রদ্ধার পাত্র নিমাই। শুধু নবদ্বীপে কেন? বাইরেও তখন ছড়িয়ে পড়েছে যশের সৌরভ। ছেলেকে বিয়ে করালেন শচীদেবী। গৌরাঙ্গের পাশে এনে দাঁড় করালেন লক্ষ্মীপ্রিয়াকে। কপালে সুখ সইল না। লক্ষ্মীও চলে গেলেন। কিন্তু শচীদেবীর প্রচেষ্টার বিরাম নেই। তাঁর নিমাইয়ের কালো মুখ তিনি দেখতে পারেন না। তাই আহত মনের বেদনা যেতে না যেতেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনলেন গৌরসুন্দরের জন্য। শচীদেবী ভেবেছিলেন, রূপে, গুণে, বিনয়ে, নম্রতায় ও নিপুনতায় নিমাইকে নিশ্চয়ই খুশী করতে পারবে বিষ্ণুপ্রিয়া। তা পেরেছে বই কি। বেশ ছন্দে, সুরে নিয়মে নিষ্ঠায় শচীদেবীর সংসারের ধারা বয়ে চলেছিল। কিন্তু একি হল? গয়ার গোবিন্দ কি শচীদেবীর সব সুখটুকুই কেড়ে নিতে চান!

হে প্রভু, তুমি অনাথিনীর শেষ ভিক্ষাটি মঞ্জুর কর। বিশ্বম্ভরকে তুমি আমার কোল থেকে কেড়ে নিওনা! হে কৃপাকঠোর তোমার এক বিন্দু করুণা বর্ষিত হোক।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বৃদ্ধা শচীদেবী মনের মত করে সাজান। রূপসীর রূপে যদি নিমাইয়ের দৃষ্টি খোলে! যৌবন-উন্মিল প্রিয়া। দেহে তাঁর অঢেল ঐশ্বর্য। নিমাই যুবক। তাঁর পুরুষ মনটা নিশ্চয়ই এমন একটি ভোগের সামগ্রির স্পর্শে সহজে নেমে আসবে। কিন্তু শচীদেবীর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যৌবনাযুবতীর দেহ কোষে নিমাই আর আবদ্ধ নেই। তিনি প্রিয়ার মাঝে দেখতে পান বিশ্বসৌন্দর্যের অশেষ প্রকাশ। খোঁজেন এই রূপ-শ্রষ্টাকে। তাই তো প্রিয়াকে কাছে বসিয়ে দিতে থাকেন দীর্ঘ উপদেশ। বোঝান সংসার অনিত্য। কথা বলতে বলতে কখনো ওঠেন গর্জন করে। বিকট সে শব্দ। প্রিয়া ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠেন। মুখ শুকিয়ে যায়। তাঁর কোমল বক্ষ দুরু দুরু করে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসে উঁচু বক্ষ নেমে যায় খাদে। তাড়াতাড়ি করে পাখা দিয়ে হাওয়া করেন বিষ্ণুপ্রিয়া। করেন স্বামীর পদ সম্বাহন।

আবেশে অবস তনু। চোখে ঝরে জল। নিমাই আর ভাবে নেই। এখন তাঁর অন্তরে সদানিয়ত কৃষ্ণ অদর্শনের কান্না।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতে থাকেন, "ওগো, আমার এখন আর কোনো কথা শোনবার বা বুঝবার সাধ্য নেই! নাম করো! কৃষ্ণ নাম! আমায় শীতল কর কৃষ্ণনাম শুনিয়ে।"

নিমাইয়ের মুখে কথা ফুটেছে। একটু সাহস ও ভরসা পেলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আরো ঘন হয়ে বসলেন। নৈকট্যের মন্দিরে জ্বালিয়ে দিলেন প্রাণের শিখাটি। ধীরে ধীরে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, "আমি কেবল তোমার নামটিই জানি গো। তোমাকেই চিনি। আর তো কিছু জানি না। তুমি একটু শান্ত

হও। তুমি যে মাকে এত ভালবাস, ভক্তি কর, মায়ের যে কত দুঃখ, তা কি তুমি বোঝ না ?

নির্বিকার নিরাসক্ত একটি প্রত্যুত্তর, "মাকে রক্ষা করবেন কৃষ্ণ।"

কৃষ্ণনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের উদ্দীপন হল। "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ !" বলতে বলতে দেহ অবস হয়ে গেল নিমাইয়ের। নিথর। নিস্পন্দ। ক্রমে কণ্ঠ নীরব হল। অন্তর হয়ে উঠল নাম জপে মুখর। এ যেন একটি প্রশান্ত সমুদ্র। বিষ্ণুপ্রিয়া তারই বুকে একটি প্রস্ফুটিত সরসিজ।

রাতের পর রাত কেটে যায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বীতনিদ্র আঁখি দুটি আকাশ প্রদীপের মত জেগে থাকে গৌর-শিয়রে।

এমনি করেই ভোর হয়। পাখী ডাকে। পুবের আকাশে পড়ে আলোর আলপনা। নিমাইয়ের ধ্যান ভাঙ্গে। সমাপন করেন প্রাতঃকৃত্য। তারপরে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বলতে থাকেন মধুক্ষরা কণ্ঠে—"কলিতে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সর্বথা লাভের সহায়ক। এসো আমরা সেই নাম শুধা আকণ্ঠ পান করি।"

জনৈক ভক্ত বলে উঠলেন, "গুরুদেব! তাই ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করব, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্তন কিরূপ জানি না, আমাদের শিখিয়ে দাও।"

কেদার রাগে গৌরাঙ্গ সুন্দর অন্তর নিঙড়ান সুরে হাতে তালি দিয়ে গাইতে আরম্ভ করলেন—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

ভক্তগণকে গৌরাঙ্গ সুন্দর কৃষ্ণ-কীর্তন শিখালেন। নদীয়ার নগর-জীবনে এল কৃষ্ণ-নামের প্লাবণ। সব ছেড়ে দিলেন নিমাই। নাম রসে নিমজ্জিত হলেন আকণ্ঠ। আনন্দের অমিয় সায়রে

ডুবু ডুবু নবদ্বীপ। নিমাইয়ের ভাবদর্শনে সবাই মুগ্ধ। কীর্তনের সুর সুধায় যে ভজনের এমন মাধুর্য অভিব্যক্ত হয়, তা পূর্বে কারো জানা ছিল না। জানা ছিল না নাম করতে করতেই নামীর দর্শন মেলে। তাই সবাই বলে উঠল, "জগতে যে এরূপ ভক্তি আছে, তা পূর্বে কারো জানা ছিল না।"

নবদ্বীপে এই প্রথম শ্রীনাম কীর্তনের সূচনা হল। প্রাচীন পদ কর্তা বাসু ঘোষ গাইলেন—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোনা॥"

নিমাই আনলেন নতুন সংবাদ। কি সে সংবাদটি? যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা, তপস্যা, প্রার্থনা ছাড়াও ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। কি উপায়? নিমাই নিজে ভজন করে দেখালেন কীর্তনের মহিমা। ১৪৩০ শকে "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্তনের প্রবর্তন করলেন। জীবকে দেখালেন ঈশ্বর প্রাপ্তির সহজ পথটি। ভক্তগণ নতুন পথের সন্ধান পেয়ে পরম তৃপ্ত হলেন। হলেন উপকৃত। সঙ্কীর্তনের সমুদ্র মন্থনে কৃষ্ণ-কৃপা বর্ষিত হতে লাগল।

ওদিকে শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠেও কীর্তন। সে কীর্তন কান্নার। সে কীর্তন বিরহ-বেদনা বিধুর।

॥ চৌদ্দ ॥

গহন ঘন অরণ্য।

শ্বাপদ সঙ্কুল পথ।

জন মানবের সাড়াটি পর্যন্ত নেই।

এখানে দিনের আলো ফোটে পাখীদের কল গুঞ্জনে।

রাতে বিচরণ করে হিংস্র পশু।

এই দুর্গমের দিগন্তে ও কার কণ্ঠস্বর?

কার কান্না করুণ কণ্ঠ বনবিথারের কানে কানে কয়ে যাচ্ছে প্রাণের কথাটি?

কে, কে তুমি?

এগিয়ে এলেন ঈশ্বরপুরী।

বৃন্দাবনের পথে পথে একটি মানুষ পাগলের মত কি যেন অন্বেষণ করছেন।

ঈশ্বরপুরীর কাছে এগিয়ে এলেন মানুষটি। পরম আগ্রহ ভরে তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের পানে। এযে পরিচিত ব্যক্তি। পরম বৈষ্ণব। ঈশ্বরপুরীর একান্ত আপন জন। তাই তো স্নেহাসক্ত কণ্ঠে ঈশ্বরপুরী শুধালেন, "শ্রীপাদ, তুমি কাকে খুজছ?"

"আমি খুঁজছি আমার কৃষ্ণকে!"

"তাঁকে এখানে কোথায় পাবে?"

—তবে?

—তিনি তো এখানে নেই।

—তবে। কোথায় পাব তাঁরে? কোথায় পাব সেই বনমালী বংশীধারীকে? তুমি তাঁকে দেখেছ?

—দেখেছি।

—দেখেছ! কোথায়? কত দূরে? কোন পথে?

নিত্যানন্দের আকুলতাভরা অশ্রু সজল চোখ দুটির পানে তাকালেন ঈশ্বরপুরী। ভক্তের আকুল ক্রন্দন পুরীর প্রাণকে করল দ্রবিভূত। তিনি নিতাইকে সন্ধান বলে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের, "শ্রীকৃষ্ণ এখানে নেই। তিনি শ্রীনবদ্বীপে শচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন তাঁর নাম নিমাই পণ্ডিত। তুমি যদি তাঁকে চাও তো সেখানে যাও।"

বর্ধমানের একচাকা গ্রামে ছিল নিত্যানন্দের বাড়ি। শৈশবে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। হয়েছিলেন অতিথি। ছোট্ট ছেলে, কিন্তু তাঁর সর্ব অঙ্গে সুলক্ষণ। সন্ন্যাসী ছেলেটির বাবা মার কাছে বললেন—তোমাদের এ ছেলেটিকে ভিক্ষে দেবে আমাকে?

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করতে পারলেন না ওঁরা। সানন্দে অর্পণ করলেন বুকের সন্তানকে তীর্থ পথিকের হাতে। সেই থেকে নিত্যানন্দ গৃহছাড়া।

নিত্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কুচের। নিত্য তাঁর আনন্দ বলেই, গুরু তাঁর নাম দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ। এ অবতারে তিনিই বলরাম।

পথে যেতে যেতে বলরাম ভাবছেন—কতদিন ছোট ভাই কৃষ্ণকে দেখি না! এবারে তার দেখা পাব!

আনন্দের সীমা নেই নিত্যানন্দের—

"নানা বর্ণ বস্ত্রে পাগ রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল।
হাসিয়া চলেছে পথে পায়েতে নূপুর বাজে
কেগো তুমি যে মাতোয়াল?"

পথচারীদের কথা শুনে নিত্যানন্দ বললেন—

"অমারে চেননা ভাই বাড়ি এবে নদীয়ায়
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়ে।
শুনেছ নদে অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যার
আমি নিতাই তার বড় ভাই।।"—শ্রীবলরাম দাস।

'হা কৃষ্ণ' বলতে বলতে নবদ্বীপে এসে উপনীত হলেন নিতাই। আর যেন সইতে পারছেন না অদর্শনের বেদনা। তাই ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ছুটে চলেছেন ভক্ত নিত্যানন্দ—

"নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ি তোরা বল।
ক্ষণে যুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায়।
এক কয় আর বলে, (কথা) বুঝা নাহি যায়।
ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে নিতাই প্রেম-ভরে ধায়।।"—চৈঃ মঃ

নবদ্বীপের শ্রীনন্দন আচার্যের বাড়িতে এসে হলেন উপস্থিত। গ্রহণ করলেন তাঁর আতিথ্য।

ওদিকে পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত নিমাই বলতে লাগলেন, "আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, এই নগরে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা তাকে তালাস করে নিয়ে আস। তাঁকে শ্রীবলরাম বলে মনে হচ্ছে।"

কথা বলতে বলতে নিমাই কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। বুঝি মনে পড়ে গেল সেই গোচারণ, সেই বেণুধ্বণি, সেই যমুনা পুলিন।

শিষ্যরা ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিমাই আবার বলতে লাগলেন, "তোমরা শীগ্‌গির যাও। তাঁকে নিয়ে আস। আমি যে তাঁকে না দেখে আর থাকতে পারছি নে।"

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন মুরারী, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও নারায়ণ। চারজন চারদিকে ছুটে চললেন বায়ু বেগে।

কিন্তু ওঁরা সবাই ফিরে এলেন অপরাহ্নে। বললেন—তন্ন তন্ন করে তালাস করলাম। কৈ কোথাও কোনো মহাপুরুষের সন্ধান পেলাম না ত।

এবারে উল্‌টো রীতি। ভগবান নেমে এলেন ভক্তের সন্ধানে। বললেন নিমাই আকুল করা কণ্ঠে, "তবে চল সকলে যাই, তাকে তালাস করে নিয়ে আসি।"

একটু ভালবাসা, একটু প্রেম, একটু স্মরণ, চিন্তনেই তিনি দেখা দেন। শুধু দেখা নয়, তিনি আকুল হয়ে ভক্তের পিছু পিছু ছোটেন।

চতুর্দিকে ভক্তগণ। মধ্যমণি নিমাই। চলতে চলতে এসে সোজাসুজি উপস্থিত হলেন শ্রীনন্দন আচার্যের আঙ্গিনায়।

বাড়ির বাইরে বসে আছেন দীর্ঘদেহী ৩০ বছরের এক প্রৌঢ়। তাঁর পরিধানে নীল বস্ত্র। মস্তকে নীল আচ্ছাদন। উজ্জ্বল শ্যাম বরণ। পদ্ম চক্ষু। একাকী বসে বসে হাসছেন তিনি আপন ভাবে।

নিমাই এগিয়ে এলেন কাছে। প্রণাম করে দাঁড়ালেন তাঁর অগ্রে। নিত্যানন্দ অপলক তাকিয়ে রইলেন গৌরসুন্দরের পানে—

"বিশ্বম্ভর মূর্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য বাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুন নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥" চৈঃ ভাঃ

চার চোখের পরম মিলন হল। মুগ্ধ বিস্ময়ে নিত্যানন্দ গৌর-সুন্দরের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "আমি সমুদায় কৃষ্ণের স্থান দর্শন করেছি, দেখলাম সিংহাসন শূন্য, কৃষ্ণ নেই।··· শুনলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন নবদ্বীপে আছে। তাই শুনে এখানে বড় আশা নিয়ে এসেছি। আর শুনলাম যে নবদ্বীপে বড় হরি সংকীর্তনের ঘটা

হচ্ছে। কেউ বা বললেন যে, স্বয়ং শ্রীভগবান সেই সংকীর্তনে মিশে ভুবনমোহন নৃত্য করে থাকেন। আরও শুনলাম যে নবদ্বীপের মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নেই। আমি তাতে আশান্বিত হয়ে এখানে এসেছি। এখন আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা করব।"

"ঠারে ঠোরে" দুজনে কথা হল। নিতাই ছিলেন একটু তোতলা। তাই তিনি তেমনি ভঙ্গিতে বললেন—

"কা—কা—কানায়ে না কি তুই রে!
কই তোর চূড়া বাঁশরী?"

নিমাই উত্তর করলেন—

"কি পুছসি ভাই আমার।
ব্রজের খেলা দৌড়া দৌড়ি।
এবার নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরি গান॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপীন পরা?"

উভয়ে উভয়ের ভাবসম্বরণ করলেন ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে। সহজ স্বভাবে ফিরে এলেন নিমাই। বললেন, "শ্রীপাদ! কাল পূর্ণিমা, ব্যাসপূজার দিন; আপনার ব্যাসপূজা কোথায় হবে?"

নিত্যানন্দ শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললেন, "আমার ব্যাসপূজা এই বাম্‌নার ঘরে হবে।"

নিমাই শ্রীবাসকে বললেন, "পণ্ডিত তোমার ঘরে ব্যাস পূজা হলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝা পড়বে।"

কিন্তু শ্রীবাস বললেন, "তোমার কৃপায় আমার তাতে কষ্ট হবে না। ঘরে ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি আছে, তবে পূজার পদ্ধতি পুস্তক নেই। তা চেয়ে নেব।"

সন্ধ্যা সমাচ্ছন্ন নবদ্বীপ। সবাই মিলে শ্রীবাসের অঙ্গনে চললেন। আনন্দের বান ডাকল শ্রীবাসের আঙ্গিনায়। শুরু হল নাম সংকীর্তন। নিমাই নিতাই হাত ধরাধরি করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্যের তালে তালে নিমাইয়ের আবেশ হল। উদ্দীপন হল বলরামের। সহসা তিনি নৃত্য ছেড়ে আরোহন করলেন বিষ্ণুখট্টায়। ক্রমে ভগবানের আবেশ হল। নিমাই ভাব গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আজ আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হল। আজ আমার নিত্যানন্দ এসেছেন, কিন্তু নাড়া কোথায়? নাড়া কেন আমায় ফেলে গেল? নাড়া হুঙ্কার করে আমাকে নিয়ে এল, এখন কোথায় গিয়ে সে নিশ্চিন্ত রইল? এ ত নাড়ার উচিত নয়।"

যে যার মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। কার কথা বলছেন নিমাই! কে নাড়া? শ্রীবাস অবশেষে কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসলেন, "প্রভু! আপনি 'নাড়া' কাকে বলছেন, আমরা বুঝতে পারলাম না।"

দয়া করে গৌরাঙ্গ সুন্দর বললেন, "আমার অদ্বৈতকে আমি 'নাড়া' বলে থাকি। তার নিমিত্তই আমার এ অবতার। আমি এবার ব্রহ্মার দুর্লভ যে শ্রীভগবদ্ভক্তি তা অতি অধম জীবকেও দান করব।"

একটু পরে আবার বলতে লাগলেন, "পণ্ডিত! আমি কি প্রলাপ বকছিলাম?"

শ্রীবাস বললেন, "কই না তো! তুমি যেমন ছিলে তেমনিই আছ।"

বিনয়ের অবতার নিমাইয়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হল, "আমি অবোধ বালক, যদি কিছু অপরাধ করে থাকি, তোমরা কৃপা করে আমার অপরাধ নিও না।"

নিমাইয়ের রূপ ঢাকা রূপটি দেখে প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে

ফেলেছেন। নিশীথ নির্জনে নিতাই ভেঙ্গে ফেললেন তাঁর দণ্ডকমণ্ডলু। দ্বাদশ বর্ষে ঘর ছেড়েছেন নিতাই। বিংশতি বর্ষ ঐ দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজছেন কৃষ্ণকে। বৃন্দাবনের পথে পথে পাগলের মত বিচরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর দর্শন মেলেনি। কমণ্ডলু আর দণ্ড দুই-ই সন্ন্যাস ধর্মের চিহ্ন। কি হবে এ দিয়ে! নবদ্বীপের চাঁদ সোনাকে দর্শন করতে হলে চাই যে ভক্তি অঞ্জন। চাই ভালবাসার অশ্রু। দণ্ডকমণ্ডলুর ঠাঁই সেখানে নেই। তাই নিত্যানন্দ সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিলেন দূরে।

ভোর হল। শ্রীবাস দেখেন নিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞান শূন্য। ভগ্ন তার দণ্ডকমণ্ডলু। সংবাদটি তিনি জানালেন গৌরসুন্দরকে।

ছুটে এলেন নিমাই। নিত্যানন্দ তখনো ভাবের নভে মুক্ত বিহঙ্গ। আপন মনে কথা বলছেন। অস্পষ্ট সে কথা। তখন সকলে নিতাইকে নিয়ে যাত্রা করলেন গঙ্গা-স্নানে।

স্নানান্তে ব্যাস পূজা শুরু হয় শ্রীবাসের অঙ্গনে। পূজা হয়ে গেল। এবারে মালা দানের পর্ব। শ্রীবাস বললেন নিত্যানন্দকে "এই নাও মালা ধর। অর্পন কর ব্যাসদেবকে।"

মালা ধরলেন নিতাই। বললেন শ্রীবাস, "বল, নমো ব্যাসায়।"

নিতাই বলেন, "হুঁ"

শ্রীবাস বলেন "হুঁ, কি? বল নমো ব্যাসায়।"

এবারও নিতাই বলেন, "হুঁ।" কিন্তু তাঁর চোখ দুটি যেন কাকে তখন খুঁজছে।

অনন্য উপায় শ্রীবাস ডাকলেন নিমাইকে, "প্রভু একবার এদিকে আসুন। শ্রীপাদ ব্যাস পূজা করছেন না। শুনছেন না। আর কি যে বলছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না।"

নিমাই ত্রস্ত পায়ে ছুটে এসে বললেন, "শ্রীপাদ! ব্যাস পূজা করুন।"

নিতাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য। তিনি যে কি করছেন, তা তিনিই

জানেন না। সহসা নিমাইয়ের পানে চোখ পড়তেই আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন। ব্যাসের জন্য যে মালাটি ছিল হাতে তা পরিয়ে দিলেন নিমাইয়ের গলে। সঙ্গে সঙ্গে নিমাই ষড়ভুজ হলেন!

নিমাইয়ের অপরূপ রূপ দর্শনে নিতাই থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ক্রমে পড়ে গেলেন মূর্ছিত হয়ে। নিমাই তার রূপ সম্বরণ করলেন। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নিতাইয়ের অঙ্গে। প্রভু স্পর্শে নিতাই ফিরে পেলেন জ্ঞান। নিমাই বলতে লাগলেন, 'নিত্যানন্দ ওঠ, সংকীর্তন কর। জীবকে প্রেমদান করে উদ্ধার কর। তুমি যাকে খুশী প্রেম বিলাও। তোমার ত সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আর কি চাও?"

কীর্তন-মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন নিত্যানন্দ। পূর্ণ হল তাঁর কৃষ্ণ-অন্বেষণের বাসনা। দর্শন পেলেন তিনি শ্রীভগবানের। নদীয়ার নিমাই-ই পূর্ণ ব্রহ্ম। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

পর দিবস নিত্যানন্দকে নিয়ে নিমাইচাঁদ বাড়িতে এলেন। ডাকতে লাগলেন উদাত্ত কণ্ঠে, "মা তোমার আর একটি ছেলে, আমার বড় ভাইকে নিয়ে এসেছি। ইনি তোমার বিশ্বরূপ মা।"

শচীদেবী ঘর থেকে ছুটে এলেন বাইরে। অপলক দৃষ্টিতে নিতাইয়ের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাপু, নিমাই বলছে তুমি আমার পুত্র। এ কি সত্য?"

নিতাই বললেন, "হ্যাঁ মা, আমি তোমার বিশ্বরূপ"

তবে সত্যিই তুই ফিরে এসেছিস! আনন্দে আত্মহারা শচীদেবী "বাপ" 'বাপ" বলে নিত্যানন্দকে কোলের মধ্যে জাপটে ধরলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কান্নায় তাঁর নয়ন দুটি সিক্ত হয়ে গেল। বারে বারে বলতে লাগলেন, —"এতদিন মাকে ফেলে থাকতে আছে? ভালই হল, আমার

ক্ষ্যাপা নিমাই এতদিন সহায়হীন ছিল, এখন তুমি ভাইটিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করো। আজ আমার নিমাইয়ের জন্য দুর্ভাবনা দূর হল।”

“নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে নীর গদ গদ বাণী॥
এই মত স্নেহ-রস গর গর।
দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর॥” চৈঃ মঃ

॥ পনের ॥

এদিকে অদ্বৈতের জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীবাসের বাড়িতে আবেশ হওয়ার পর থেকে এখন প্রায় নিত্যই তিনি ঈশ্বরাবেশে তন্ময় হয়ে যান। সেদিনও ঘটল তাই। আকুল কণ্ঠে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভাইকে বললেন, "শ্রীরাম! তুমি শান্তিপুরে যাও, গিয়ে বল অদ্বৈতাচার্যকে—যাঁর জন্য তিনি কঠোর উপবাস, তপস্যা ও ক্রন্দন করেছিলেন এবং যাঁকে এই ধরাধামে আনবার জন্য ভক্তিভাবে তিনি পূজো করেছিলেন, সেই তিনিই আমি, তাঁর আকর্ষণে এসেছি। অদ্বৈত এখানে সস্ত্রীক আসুন, এসে আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।"

ভগবানের আদেশে রামাই ছুটলেন শান্তিপুরের পথে। আনন্দে অধীর তিনি। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ মুখের বাণী বহন করে আসছেন তিনি।

অদ্বৈত কিন্তু পূর্বাহ্ণেই সব টের পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি জানতেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গকে নিয়ে শ্রীবাস এবং শ্রীরাম আনন্দের বাজার মিলিয়ে বসেছেন। এবং এই তরুণের ভাবে ভাষায় তাঁরা একেবারেই মজে গিয়েছেন।

অভিমানী অন্তরাহত অদ্বৈত শ্রীরামকে কাছে পেয়ে তাই বলতে লাগলেন, "বুঝেছি, আমাকে নিতে এসেছ। আমি যাব কেন? আমি কি বস্তু তোর দাদা শ্রীবাস তা জানে। তোরা একটা বালককে নিয়ে মত্ত হয়েছিস, আমি তো তোদের মত নির্বোধ নয়, যে আমিও মাতব। তোদের আবার অবতার! কোন্ শাস্ত্রে তোদের আবার অবতার রে?"

শ্রীরামের অন্তর অদ্বৈতের কটাক্ষ স্পর্শ করতে পারে না। তিনি

যে পরম জনের কৃপা পেয়েছেন! তাই হাসতে হাসতে বললেন, "শাস্ত্র তুমি জান, আমি কি জানি? তবে শ্রীভগবান কি বলে দিয়েছেন তা শোন। তুমি যাঁর জন্য এত ক্লেশ পেয়েছ, তিনি তোমারই আকর্ষণে গোলক ছেড়ে জীবের দুঃখ দেখে, কৃপার্ত হয়ে জীব উদ্ধার করতে এসেছেন।"

শ্রীরামের দুচোখ প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল। অশ্রুঝরা নয়নে অদ্বৈতের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন আবার, "তুমি ও তোমার স্ত্রী চল সেখানে! তোমাকে তিনি ডেকেছেন।"

শ্রীরামের কান্না শ্রীঅদ্বৈতের ফল্গু হৃদয়ে তুফান তুলে দিল। তিনিও তখন কাঁদছেন আর বলছেন, "সত্যি তিনি এসেছেন? তিনি এসেছেন? আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি? এ কি সত্যি?"

সহসা অদ্বৈতের কি যেন হল। বারুদের স্তূপে পড়ল দেশলাইয়ের কাঠি। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন শ্রীঅদ্বৈত, "এনেছি, এনেছি। তাঁকে এনেছি!"

স্বামীর মুখে সব কথা শুনলেন সীতা দেবী। যাত্রা করলেন দুজনে। কিন্তু যেতে যেতে মনের দিগন্তে দেখা দিল ছোট একটুকরা কালো মেঘ। রামাইকে তাই বললেন, "আমি নন্দ আচার্যের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকব। তুমি তাঁকে সে কথা বল না। তুমি গিয়ে বলবে, অদ্বৈত আচার্য এলেন না। দেখি তিনি কি করেন। আমার মাথায় যদি নিমাই পণ্ডিতের পা তুলে দিতে সাহস হয়, তবে বুঝব আমার প্রাণের ঠাকুর এসেছেন। আমার আরাধ্যতম দেবতা আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্রীরামাই গর্বভরে বললেন, "বেশ তাই হবে। তাই ভাল! ভেবেছ প্রভু জানতে পারবেন না? একবার কাছে চল। তখন তুমি সব বুঝতে পারবে।"

ভগবানকে পরীক্ষা করবেন ভক্ত!

বলি, স্পর্ধা তো কম নয় বড়!

কম হবে কেন ?

ভক্ত ছাড়া ভগবানের যে চলে না।

তাই তো বাউল তাঁর মনের মানুষকে ডেকে বলেছেন—

'আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কেবল খুঁজি তাঁরে।'

বেশ কথা। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভক্ত বাউল তার ভক্তির টানে এবং ভালবাসার গভীরতায় অভিমানী হয়ে বলছেন—

'আমার একলা দায় নয় গো
একলা দায় নয়।
তোমার মুখের চাই তো হাসি
তোমার ফুঁকের চাই তো বাঁশী
তাই ধরতে যে হয় আমারও পায়।'

ভক্তের মান ভাঙ্গাতে, তাঁর সঙ্গে প্রেমের খেলা জমাতে ভগবানকেও নেমে এসে ধরতে হয় ভক্তের চরণ যুগল।

যাঁর আকুল আহ্বানে ভগবান নেমে এলেন মর্ত্তীর্থে, তাঁর ব্যাকুল জিজ্ঞাসাটির জবাবও নিশ্চয়ই দেবেন তিনি।

পরম ভক্ত অদ্বৈত আসছেন। নিমাইয়ের আনন্দ আর ধবে না। তিনি গমন করলেন শ্রীবাসের বাড়িতে। আরোহণ করলেন বিষ্ণুখট্টায়। ভগবানের আবেশে অবস তনু ধারণ করল অন্যরূপ। অন্যকান্তি। ভক্তগণের মধ্যে পড়ে গেল সাড়া। নিত্যানন্দ ছত্র ধরলেন মস্তকে। তাম্বুল যোগাচ্ছেন গদাধর। ছন্দে ছন্দে চামর দোলাতে লাগলেন নরহরি। শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ যুক্ত করে দণ্ডায়মান ঈশ্বর সমীপে। সবাই নীরব। নিথর। শুধু উৎকর্ণ হয়ে আছেন প্রভুর মুখের বাণী শোনবার জন্য। তখন ধীর গম্ভীর কণ্ঠে প্রভু বলতে লাগলেন, "অদ্বৈত আচার্য এসে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য নন্দ আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে আছেন। তাঁকে শীঘ্র নিয়ে এসো।"

রামাই বাড়ি যাওয়ার পূর্বেই নন্দ আচার্যের ওখানে গিয়ে হাজির হলেন মহাপ্রভুর আজ্ঞাবহ ভক্তবৃন্দ। অদ্বৈত ঘাট মানলেন। প্রেমের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল তাঁর দুটি নয়ন। সীতাদেবীকে নিয়ে অর্চনার উপচার সহ অদ্বৈত যাত্রা করলেন তাঁর অন্তরতমকে দর্শন করতে। কিন্তু পথ চলতে চলতে মনটা আবার সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল। নানা কথা নানা ভাবনার মধ্য থেকে একটা প্রশ্ন তাঁকে বারে বারে আন্দোলিত করতে লাগল—সত্যিই কি আমার কাতর ক্রন্দনে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন ?

ঈশ্বরের কাজ সংঘটিত হয় সূক্ষ্ম ভাবে। তিনি গোপনে গহনে মনে মনে সমাধা করেন তাঁর লীলাখেলা। অদ্বৈতের বেলায়ও তাই হল। তিনি যতই নিকটবর্তী হচ্ছেন, ততই দৃঢ় হচ্ছে তাঁর বিশ্বাস। সম্বন্ধ হয়ে আসছে অন্তিক। ক্রমে শ্রীবাসের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছে গেলেন। এবারে দুরু দুরু করছে অদ্বৈতের মন। থর থর করে কাঁপছে তাঁর হাত পা। ঘন ঘন শ্বাস বইছে। চোখ দুটো যেন জলে ভরে আসতে চাইছে।

শ্রীবাসের বাড়িতে পৌঁছে আর পা বাড়াতে পারছেন না অদ্বৈত। এবারে তাঁকে সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে যুগল হয়ে সীতাদেবী ও অদ্বৈত প্রনাম করতে করতে মহাপ্রভুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যতই ঘন হচ্ছেন, ততই দেখছেন অপরূপ লীলা বৈচিত্র্য। দেখছেন—

"জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ময় কনকসুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥" শ্রীশ্রী চৈঃ ভাঃ

অপলক অদ্বৈত। দেখছেন আর দেখছেন—

"কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।

জ্যোতির্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥" চৈঃ ভাঃ

যেদিকে আঁখি ফেরায় সেদিকেই জ্যোতির জোয়ার। রূপের ছটা। শুধু কি তাই? অদ্বৈত আরও দেখতে লাগলেন। দেখতে লাগলেন অনন্ত কোটি জ্যোতির্ময় দেবগণ শ্রীনিমাই পণ্ডিতের স্তুতি করছেন। ঋষিগণ করযোরে পাঠ করছেন বেদ। দেবগণ, ঋষিগণ একসঙ্গে নিমাইরূপ ঈশ্বরের সেবায় মগ্ন। একাগ্র।

"ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা ঋষিগণ পাশে ॥" চৈঃ ভাঃ

নির্বাক অদ্বৈত। চোখে তাঁর বিস্ময়। অপলক আঁখিতে দর্শন করছেন তিনি গৌরসুন্দরের স্ব-রূপটি।

বড় দীন, বড় ছোট মনে হল নিজেকে। দেবতা এবং ঋষিগণ যার চরণ বন্দনায় রত, সেখানে গিয়ে কি পৌঁছবে অদ্বৈতের নীরব প্রণামটি?

অন্তরতম রাখেন অন্তরের খোঁজ। সঙ্গে সঙ্গেই অদ্বৈতের মনের মেঘ দূর করে দিয়ে বলে উঠলেন মহাপ্রভু, 'ওহে অদ্বৈত, তোমার আকর্ষণে আমি এসেছি। এখন তুমি জীবকে ভক্তি আর প্রেম বিতরণ কর।'

অদ্বৈত চমকে উঠলেন। বললেন বিনীত কণ্ঠে, 'প্রভু, আমি তোমাকে এনেছি, এ কথা বললে তা কে প্রত্যয় করবে? তুমি জীবের দুঃখে নিজেই এসেছ। আমি তো কীটানুকীট। আমি তোমাকে কিরূপে আনব? এবারে ঐ চরণ পূজো করে আমার জনম সফল করতে অনুমতি দাও।'

স্বামী স্ত্রী উভয়ে পূজো করলেন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ যুগল। নেমে এলেন অদ্বৈত অহংকারের চূড়া থেকে মাটির সমতলে। মহাপ্রভু বললেন, 'নাড়া, এবারে নৃত্য কর, আমি দেখি।'

অদ্বৈত তাই করলেন। কান্নার দীক্ষায় দীক্ষিত হলেন। গ্রহণ করলেন নৃত্য, গীত আর ভজনের পথ।

এবারে বর দানের পর্ব। প্রভু বললেন, 'অদ্বৈত তোমার যা ইচ্ছে বর নাও।'

অদ্বৈত প্রার্থনা করলেন, 'তুমি যে প্রেম ভক্তি বিতরণ করতে এসেছ, তা থেকে যেন নীচ বলে কেউ উপেক্ষিত না হয়।'

প্রভু বললেন, 'তথাস্তু। সার্থক ভক্তের সার্থক প্রার্থনা।'

অদ্বৈত ফিরে এলেন শান্তিপুরে। চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গেল নদীয়া বিনোদের বারতা। নবদ্বীপে সংঘটিত হল মহাসম্মেলন। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এলেন পুণ্ডরীক। প্রাণ বন্যার রস-সমুদ্রে ডুবুডুবু নবদ্বীপ। দিক দিগন্ত থেকে ছুটে আসতে লাগলেন ভক্তবৃন্দ গৌর-কন্দের সৌগন্ধে। নিত্যানন্দ অদ্বৈত, গদাধর, নরহরি, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর, জগদানন্দ, মাধব, গোবিন্দ, হরিদাস, পুণ্ডরীক, বক্রেশ্বর, সারঙ্গ, বাসুঘোষ, দামোদর –এরা সবাই হয়ে উঠলেন গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ। পেলেন তাঁর স্ব-রূপ দর্শন। বললেন সবাই—তুমি আমাদের আরাধ্য! তুমিই সেই আদির অনাদি। তোমাকে প্রণাম!

॥ ষোল ॥

শ্রীবাসের বাড়ি।

স্নান সমাপন করে এসে উপস্থিত হলেন প্রভু। বসলেন ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে। শুরু করে দিলেন কীর্তন। কৃষ্ণ নামে মুখরিত হয়ে উঠল শ্রীবাসের অঙ্গন। সহসা প্রকাশ হয়ে পরলেন প্রভু। আরোহণ করলেন বিষ্ণু-খট্টায়। এ আর গৌর রূপ নয় —স্বয়ং ভগবান বসে আছেন খট্টায়। প্রভু বলছেন ভক্তবৃন্দকে—তোমরা কৃষ্ণনাম কীর্তন কর।

কিন্তু তাঁরা গেয়ে উঠল—জয় গৌরাঙ্গ! প্রাণ গৌরাঙ্গ! গৌরাঙ্গই প্রাণ। গৌরাঙ্গই আত্মা। গৌরাঙ্গই সেই পূর্ণ স্বরূপ। আনন্দে, হুলুধ্বনিতে প্রভুর অভিষেক সম্পন্ন হল। অদ্বৈত লোক পাঠিয়ে নিয়ে এলেন শচীদেবীকে। জননী এসে দেখলেন পুত্রের পরম ব্রহ্ম রূপ। এ যে ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান। মনের আনন্দে ভক্ত বেশে ভক্তিমতি শচীদেবী আরতি করতে লাগলেন গৌর মন্দিরে। তারপরে পরম তৃপ্ত হয়ে ফিরে এলেন ঘরে। এসে সব কথা বললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। নীরব শ্রোতার মত শুধু শুনলেন। জবাব দিলেন না কিছুই।

ওদিকে ভক্তাধিপতি ভক্তদের নিয়ে মত্ত। কিন্তু ও রূপ আর যেন সহ্য করতে পারছেন না তাঁরা। তাই বললেন—হে প্রভু, তুমি তোমার ঐশ্বর্যের তেজদীপ্তি সম্বরণ কর। নেমে এস সহজে। আমরা যে আর সইতে পারছিনে!

ভক্তের কান্নায় ভগবান সহজ হলেন। কিন্তু পড়লেন মুর্ছিত হয়ে। একেই বলে গৌরাঙ্গের 'সাত পহরিয়া প্রকাশ।'

জ্ঞান আর কিছুতে ফিরছে না দেখে অদ্বৈত ধরলেন কুঞ্জ

ভক্তের গান—'ওঠো ওঠো গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল—' প্রভু এবারে তাকালেন চোখ মেলে। ভক্তগণ ফেললেন স্বস্তির নিশ্বাস।

তরুণ নিমাই আজ মানুষের অন্তরের সম্রাট। কৃষ্ণ নামের বন্যায় প্লাবিত নবদ্বীপ। শুধু নবদ্বীপ কেন, সারা বাংলার ঘরে ঘরে সেদিন বেজে উঠল মৃদঙ্গ আর করতালি।

কিন্তু দুটি অভক্ত নাস্তিক কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না কৃষ্ণ নাম। তাদের হৃদয়ের পাপবৃত্তিগুলো কৃষ্ণ নাম ভীতিতে আরো হিংস্র আরো কপট হয়ে উঠল। এরা দুজনেই রাজকর্মচারী। নাম জগাই এবং মাধাই। তারা মদাসক্ত। পাপাচারী। কু-কর্মই তাদের বৃত্তি। নর হত্যায় তারা অকম্পিত। পটু। জগাই মাধাই নবদ্বীপে কুখ্যাত। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছে বটে, কিন্তু অবতীর্ণ হয়েছে পাষণ্ডের ভূমিকায়। ওরা নবদ্বীপের সন্ত্রাস।

সেদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস নাম গান করতে করতে চলেছেন মহাপ্রভুর বাড়ির দিকে। পথে দেখা হল দুই ভাই জগাই মাধাইয়ের সঙ্গে। তারা পথ আটকে দাঁড়াল। নিতাই বললেন—একবার প্রাণভরে বল জগাই মাধাই, 'ভজ হরি জপ হরি—'

আর কোনো কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙ্গা কলসীর কানা দিয়ে মাধাই আঘাত করল নিত্যানন্দের মস্তকে। রক্তের ধারা নামল। নিত্যানন্দের রক্তের ফিন্‌কি মাটি লাল করে দিল। কিন্তু তখনো তিনি মুখ থেকে নাম ছাড়েন নি—

'ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ঝড়ে
'গৌর বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে।'

মত্ত মাতাল মাধাই। তার রাগ কিছুতেই পড়ে না। সে আবার তুলে আনল আর একটি ভাঙ্গা কলসীর খণ্ড। উদ্যত হল আঘাত করতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল জগাই—'ছিঃ ছিঃ কি করছিস মাধা…'

নিত্যানন্দ তখন দ্বিগুণ উৎসাহে মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

'মেরেছিস মেরেছিস তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরি নাম বল মুখে ভাই ॥'

সংবাদটি গিয়ে পৌঁছিল প্রভুর কর্ণে। তিনি এলেন ছুটে। এসে দাঁড়ালেন রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। রাগে ক্ষোভে কাঁপছে প্রভুর সারাটি অঙ্গ থর থর করে। ভীতত্রস্ত নিতাই উঠলেন শিউরে। কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন—'প্রভু শান্ত হও। অবোধ মাধাইয়ের শক্তি কোথায়, এই করুণার বেগ সহ্য করে? মাধাই আমাকে মেরেছে বটে। কিন্তু জগাই রেখেছে আমাকে বুকের আড়ালে লুকিয়ে। তুমি ওদের ক্ষমা কর।'

জগাইকে কোল দিলেন প্রভু। মাধাই লুটিয়ে পড়ল গৌরসুন্দরের চরণ তীর্থে। হয়ে উঠল তারা হরিভক্ত। উদ্ধার হল জগাই মাধাই। নবদ্বীপে পড়ে গেল সাড়া। শুরু হল ঐতিহাসিক নগর-কীর্তন। এমনি করে হরিনামের সুধা মন্ত্রে চাঁদকাজিও একদিন বশীভূত হলেন। তাঁর সকল গর্ব খর্ব হয়ে গেল গৌরসুন্দরের প্রেমস্পর্শে। নবদ্বীপের নগর-কীর্তনের আর কোনো অন্তরায় রইল না। ধনী থেকে দীন, উচ্চ থেকে নীচ, পাপী থেকে অন্ত্যজ সকলেই কৃষ্ণ নামামৃতের সুধারস পান করল আকণ্ঠ। ধুয়ে গেল তাঁদের সব গ্লানি। সব পাপ। নামবন্যায় বঙ্গ-দেশ প্লাবিত করে দিয়ে প্রভু দাঁড়ালেন মুখ ফিরিয়ে। জীবের জনতায় আপনাকে কণা কণা করে বিলিয়ে দিয়ে সাঙ্গ করলেন তাঁর নদীয়া লীলা। এবারে অন্য পথ। অন্য চিন্তা।

কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর নিমাই। কোন দিকে খেয়াল নেই। বিরহের বেদনায় আকুল। কেবল কান্না আর কান্না 'সখি! কই, কৃষ্ণ ত এল না! তোমরা দেখছ না তাকে? এদিকে যে আমার প্রাণ যায়। আমি যে আর সইতে পারছিনে তাঁর অদর্শন।'

ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দেহ যায় অসার হয়ে। দু চোখে শুধু অশ্রুর অশ্রান্ত উজান। নিথর। নিস্পন্দ।

শচীদেবীর চোখে ঘুম নেই। মুখে অন্ন নেই। সদা সর্বদা তাকিয়ে আছেন ছেলের মুখের পানে। আর যেন পারছেন না তিনি। বুকের মধ্যে করে দুরু দুরু। হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই যেন থাকে না অবশেষে।

তখনো ফেরেনি প্রভুর বাহ্যজ্ঞান। সবাই চেষ্টা করছে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। এমনি সময়ে এসে দাঁড়ালেন কেশবভারতী।

নিমাই তাকালেন চোখ মেলে। ফিরে এল জ্ঞান। কিন্তু শচীদেবীর মনের দিগন্তে সঞ্চারিত হল অশুভ মেঘ। ছায়াপাত হল অমঙ্গলের। কারণ নিমাই মুহূর্তে বসলেন উঠে। বসালেন কাটোয়ার সন্ন্যাসী কেশবভারতীকে। ভারতী আশীর্বাদ করলেন নিমাইকে। বললেন—কৃষ্ণে মতি হোক।

কিন্তু এ কি কাণ্ড! মুখ শুকিয়ে গেল শচীদেবীর।—বুঝিবা কেশবভারতী আমার সর্বনাশ করতে এসেছে।

গোপনে এবং নিভৃতে ভারতীর সঙ্গে কথা হল নিমাইয়ের। ভারতী মুগ্ধ। বিদায় নিলেন পরম আনন্দে।

এর পরে এলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এককালে একই টোলের ছাত্র ছিলেন দুজনে। তাই এলেন একটু আলাপ জমাতে। কিন্তু কিছুই সুবিধে হল না। আগমবাগীশ ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন।

কিন্তু শ্রীপাদ সব জানতেন। প্রভুর এ ভাবান্তর কেন? এর অন্তরাল রহস্যটি যে কত মর্মান্তিক তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু নিজে কিছুই বলেন নি এতদিন। আজ প্রভুর মুখ থেকেই শুনতে পেলেন তিনি, 'আমাকে এ সংসার সুখ বিসর্জন দিতে হবে।'

বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গেল নিত্যানন্দের মুখখানা, 'তবে কি তুমি সন্ন্যাস নেবে প্রভু ?'

'এ দেহে কি আর কিছু আছে ? কৃষ্ণ বিরহে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এবারে আমাকে ছেড়ে দাও ভাই। আমি কৃষ্ণ বিরহে অধীর হয়ে পথে পথে কেঁদে কেঁদে তাঁকে খুঁজব। আমার জন্য ভক্তবৃন্দ কাঁদবে ? মা কাঁদবেন। কাঁদবে বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাদের সকলের চোখের জল দেখে আসবে জীবের চোখে জল। তবেই তো দয়াময় দয়া করবেন।'

'প্রভু! প্রভু!'

'কেন কাতর হচ্ছ শ্রীপাদ ? তুমি স্থির না থাকলে যে কিছুই হবে না।'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'তুমি আছ, অদ্বৈত আছেন, আছেন শ্রীবাস, হরিদাস। তোমাদের ভরসা করেই তো আমি সাহস পাচ্ছি এত বড় ব্রত উদ্‌যাপন করতে শ্রীপাদ!'

ভক্তবৃন্দ স্তিমিত নয়নে তাকিয়ে আছেন প্রভুর পানে। প্রভু গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের। তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বেচতে পার। আমাকে তোমরা সর্বদা দেখতে পাবে। তোমরা যখনই সংকীর্তন করবে, তখনই তার মধ্যস্থলে আমি নৃত্য করব।'

শ্রীবাসের পানে তাকালেন প্রভু। করলেন একটি অঙ্গীকার 'তোমার ঠাকুর মন্দিরে দেখতে পাবে আমাকে সর্বদা। যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবেন, আমার জননী, কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ—তিনিই আমাকে দেখতে পাবেন। এই অঙ্গীকার রইল তোমাদের কাছে।'

সংবাদটি কেমন করে যেন পৌঁছে গেল শচীদেবীর কানে। অধীরা মাতা ত্রস্তপদে ছুটে এলেন নিমাইয়ের কাছে, 'ওরে, কি শুনছি রে ?'

সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধা জননী। ক্ষত বিক্ষত অন্তর। অনেক দুঃখের নদী-তরঙ্গে উজান ঠেলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে বেঁধেছিলেন একটি সুখের সংসার। বুঝিবা সে বাগানটিও শুকিয়ে যাবে। দু চোখে জলের ধারা নামল শচীদেবীর।

নিমাই মায়ের পানে তাকিয়ে কেবল বললেন,

'মা!'

'নিমাই!'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন নিমাই, 'আমাকে ক্ষমা কর। তুমি বৃদ্ধা, শোকসন্তপ্তা। আমি তোমার একমাত্র পুত্র। কি অফুরন্ত স্নেহে তুমি আমাকে পালন করেছ। নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রেখেছ বক্ষে। প্রগাঢ় মমতায় রেখেছ ঘিরে। তা আমি বুঝি। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কিন্তু মা—'

কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়। কথা বলতে আসে দ্বিধা। তবুও বলতে হবে। তাই নিমাই কম্প্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমি তোমার অক্ষম সন্তান মা। এ জন্মে পারলাম না তোমার ঋণ শোধ করতে। কোটি জন্মের চেষ্টায়ও তা আমি শোধ করতে পারব না। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম পুত্র জন্মে। মা আমি তোমার তেমনি এক সন্তান। তোমার কোনো কাজেই লাগলেম না আমি। হল না আমাকে দিয়ে তোমার সেবা। তোমার প্রতিপালন।'

'ওরে ও নিমাই, এ সব কি বলছিস তুই? ওরে আমার নবদ্বীপচন্দ্র, লক্ষ তারার এক চাঁদ, মাকে মারবার ইচ্ছা হয়েছে তোর?'

কৃষ্ণ-প্রেম বিরহী আর আজ বুঝি কোনো বন্ধনই মানবেন না। মায়ের চোখের জল দেখে নিমাই কাঁদছেন বটে, কিন্তু বলতেও কসুর করলেন না, 'যাব আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে। তুমি সহজ মনে অনুমতি দাও। এতে আমার মঙ্গলই হবে মা।'

বৃন্দাবন! সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাভূমি। কান্নায় ভেঙে পড়লেন শচীদেবী।

ক্রন্দসী জননীর পানে তাকিয়ে গৌরসুন্দর বলতে লাগলেন, 'এ জন্মে আমি কাঁদতেই এসেছি। এসেছি সকলকে কাঁদাতে। আমার দুঃখে তোমরা কাঁদবে। তোমাদের দুঃখে জীব কাঁদবে। তাঁদের পাষাণ হৃদয় গলবে। তবেই আমার লাভ হবে কৃষ্ণ-প্রেম। তখন জীবও উদ্ধার পাবে আমার কাছে নাম নিয়ে। এত বড় ব্রত উদ্‌যাপনে তোমরা আমার সহায় হবে না ? তোমরা শক্তি না দিলে আমি কোথায় পাব শক্তি ? কোথায় গিয়ে দাঁড়াব মা ?'

নীরব শচীদেবী। কি বলবেন। নিমাইয়ের কান্না দেখে তিনিও গিয়েছেন ব্যাকুল হয়ে। তিনিও অঝোরে শুধুই কাঁদছেন। কিন্তু এ কেমন ধর্ম ? জননী, জায়া এবং ভক্তবৃন্দকে কাঁদিয়ে ধর্ম আর কৃষ্ণ ? শচীদেবী বিলাপ করতে লাগলেন কাতর কণ্ঠে—

সর্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদারিয়া ॥ চৈঃ মঃ

'হ্যাঁরে নিমাই, লোকে তোকে বলে ভগবান। বলে সর্ব জীবে তোর দয়া। কেবল এই চির দুঃখিনী অভাগিনী জননীর প্রতি এত নির্দয় কেন ?'

নির্মম পাষাণের মত নির্বাক নিমাই। কিছুতেই মায়ের অনুমতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। কিন্তু তাঁর অনুমতি না পেলে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব নয়। এদিকে শচীদেবী তাঁর নিমাইকে দিতে লাগলেন কিছু উপদেশ, 'আরও কিছু দিন সংসারে থাকো। এমন তরুণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করা ধর্ম নয়। তাছাড়া তোমার কাম আছে, লোভ, মোহ সবই আছে। তোমার দেহে যৌবন প্রবল। এ ভাবে কি তোমার সন্ন্যাস ব্রত সফল হবে ?'

মায়ের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য এবারে শ্রীগৌরহরি প্রেমঘন নয়নে তাকালেন মায়ের পানে। কি যেন হয়ে গেল

শচীদেবীর। কোথায় যেন চলে এলেন তিনি। লৌকিক সম্পর্ক বর্জিত এ এক জ্ঞান-তীর্থ। তার মধ্যে দেখতে লাগলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের অপার্থিব রূপ—

সেইক্ষণে বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ বুদ্ধি হইল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল॥
নবমেঘ যিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর॥

*　　　*　　　*　　　*

দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলক আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে॥ চৈঃ মঃ

সঙ্গে সঙ্গে শচীদেবী বলে উঠলেন, 'বাপ নিমাই, আমি জেনেছি তুমি কে। আজ আমি তোমাকে মনোসুখে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি জীব কল্যাণার্থে স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস গ্রহণ কর।'

অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু হারিয়ে গেল তাঁর বাহ্যজ্ঞান। শুষ্ক জ্ঞান গুহার মাত্রাহীন ভ্রম তাঁর ক্ষণিকের। পরমুহূর্তেই ফি'রে এলেন শচীদেবী বাৎসল্যের প্রেমবন্ধনে। অনুশোচনার অনল জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন ডুকরে—'এ আমি কি করলেম! নিমাইকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিলেম।'

আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হয়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম॥ চৈঃ মঃ

'নিমাই তো আমার উপরই নির্ভর করেছিল! আমি নিজ হাতে বিসর্জন দিলাম আমার সোনার গৌরাঙ্গকে। নিমাই··· নিমাই···নিমাই!' আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন শচীদেবী।

মায়ের পানে তাকিয়ে নিমাই যেন আর পারছেন না স্থির থাকতে। তখন মাকে বর দিলেন নিমাই। বললেন, 'কেঁদনা মা। তোমাকে সব কথাই বলেছি। আমাকে যেদিন যখন অনুরাগ ভরে স্মরণ করবে, তখনই আমি তোমাকে দেখা দেব মা।'

'যে দিন দেখিতে মোরে চাই অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে॥' চৈঃ মঃ

ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন নিমাই, 'মা, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।'

—'কি ভিক্ষা বাবা?'

'আমি তো তোমার কোনো কাজেই লাগলেম না। ঘরে কাল হয়ে রইল তোমার বধূ। সে জলন্ত অগ্নি স্বরূপা। তাকে যত্ন করে কৃষ্ণনাম শিখিও। এই আমার শেষ ভিক্ষা।'

কথার জবাব দেবার মত আর শক্তি নেই শচীদেবীর। একটি বানবিদ্ধা বিহঙ্গীর মত করুণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

নিমাই এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। বললেন, 'ওঠো মা। আমি আরো কিছুদিন থাকব সংসারাশ্রমে। যাবার আগে তোমাকে না বলে যাব না মা।'

এবারেও নীরব। নীরবতার মধ্যেই চলবে কান্নার সাধনা। চলবে অশ্রুর অঞ্জলি।

॥ সতের ॥

শচীর সংসার এখন কান্নার সমুদ্র।

ছেলের মুখের পানে তাকান, আর হাউ হাউ করে কাঁদেন। দেহ চলে না। মন বিষন্ন। তবুও নিজ হাতে করেন সব কাজ। সেই রান্না থেকে শয্যা অবধি। যে দু দিন তাঁর নিমাই কাছে আছে, নিজেই তাঁর জন্য সব করবেন।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কোথা?

কোথায় সেই প্রতীক্ষিতা শবরী?

তিনি কি শোনেন নি, নিমাইয়ের নয়নে আভাসিত হয়েছে—নীল দিগন্তের ছায়া, নীলা বনরাজী, নীল যমুনা পুলিন।

তিনি কি জানেন না তাঁর হৃদয় পিঞ্জরের পাখী আজ অন্য আকাশের মোহে মুগ্ধ?

কোথায় বিষ্ণুপ্রিয়া?

অগ্রহায়ণ মাসে গিয়েছেন বাবার বাড়িতে। ফিরে আসেন নি এখনও। কিন্তু সব সংবাদই তাঁর কানে গেছে। তাই তো ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে যাত্রা করলেন পতি-গৃহের উদ্দেশ্যে। শীত শীতল রাত। নিঝুম নিস্তব্ধ চারিদিক। ঘোর ঘন অন্ধকার। পথ জনহীন। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীর পদ পাতে এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর বাবার বাড়ির একটি লোক।

খেয়াল নেই কোনো দিকে। দুরু দুরু হিয়া। আঁখিতে অশ্রুর উজান। শুধু চলছেন আর চলছেন।

ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে ধীরে। গঙ্গার বুকে ছোট ছোট ঢেউ। মাঝে মাঝে শিউড়ে উঠছে বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহ। পথ যেন আর ফুরোয় না। প্রশ্ন জাগে মনে—আর কত দূর?

এ যে অন্তহীন পথ। এ পথের কি শেষ আছে? যতদূর যাবে

কেবল কানে ভেসে আসবে আকুল করা বংশীধ্বনি। দিগন্ত বিসারিত পথের পানে তাকিয়ে শুধু বলবে—

'শুধু বাঁশী শুনেছি—
তারে চোখে দেখিনি।'

এদিকে খাওয়া হয়ে গেছে। শুয়ে পড়েছেন নিমাই। শরীরটাও ভাল নেই। তাই আজ আর যান নি কীর্তনের আসরে।

আহত হরিণীর মত এসে উপস্থিত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ধীরে পা ফেলছেন। অন্তর আথিবিথি। উৎকণ্ঠায় শুষ্ক কণ্ঠ। নীরব একটি ঘন যামের মত ঢুকলেন স্বামীর কক্ষে।

নিমাই নিদ্রিত। জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখখানা। আর সমস্ত দেহ শীত বাসে আবৃত।

স্বামীর শিয়রে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। নিথর নীরব। অপলক দেখছেন স্বামীর মুখখানা। এক সময়ে বসে পড়লেন। বসে পড়লেন খাটেরউপর স্বামীর পায়ের কাছে। কিন্তু শ্রীপদে হাত দিচ্ছেন না বিষ্ণুপ্রিয়া। যদি প্রভুর নিদ্রা টুটে যায়। শীতল হাত। নিশ্চয়ই এ হাতের স্পর্শে চমকে উঠবেন প্রভু। তাই লেপের নীচে হাত দুখানা রেখে বসে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। একটু উষ্ণ হল। এবারে কোমল করে করতে লাগলেন প্রভুর পদসেবা। আহা চরণ যুগলের কতনা লালন। কতনা যতন। দুহাতে ধরে ধীরে ধীরে ঐ চরণ যুগল চেপে ধরলেন বক্ষে। ভাবলেন প্রিয়া এ কবোষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শে প্রভুর নিদ্রা নিশ্চয় আরো গাঢ় হবে। আবার ভাবলেন এ পদস্পর্শে আমার মনের সব মালিণ্য মুছে যাবে। কিন্তু তারপর? তারপর ভাবলেন, আমি আজন্মের মত এই পদ তীর্থের স্মরণ নিলাম। পুলকে, আনন্দে, গর্বে, গৌরবে এই মুহূর্তে বিষ্ণুপ্রিয়ার মত ভাগ্যবতী আর কে আছেন জগতে? রসবল্লভা তাঁর নীরব সেবায় তৃপ্তি সাধন করছেন রসবল্লভের। এতো জীবেরই ঈশ্বর-সমীপে সেবা নিবেদন। বিষ্ণুপ্রিয়া যে জীবের প্রতিভূ।

আর প্রিয়া-প্রিয় যে জীবের প্রাণের জন। ভক্ত কাঁদলে ভগবান জাগেন। কি করে নিমাই থাকবেন নিদ্রিত? প্রিয়ার প্রেমমধুর স্পর্শ ঘুমন্ত নিমাইকে যেন ডেকে জাগাল। তাকালেন তিনি চোখ মেলে। চমকে উঠে বললেন—'প্রিয়া, তুমি!'

প্রিয়ার মুখে ভাষা নেই। নয়নে বইছে অঝোর ধারা।

দু নয়নে বহে নীর ভিজিল হিয়ার চীর
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে ওঠে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিশার॥ চৈঃ মঃ

নিমাই উঠে বসলেন। প্রিয়াকে বসালেন উরুর 'পর। টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। বলতে লাগলেন প্রশান্ত কণ্ঠে, 'প্রিয়ে, আমাকে কেন দুঃখ দিচ্ছ? আমার প্রতি কৃপা করে তোমার কথা বল। এই তো আমার কোলের মধ্যে বসে আছ তুমি। তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কিসের? কেন তোমার চোখে জল?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রু-সিক্ত নয়ন দুটি মুছিয়ে দিতে লাগলেন গৌরসুন্দর।

কি বলবেন বিষ্ণুপ্রিয়া? তার কণ্ঠ যে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কথা বলতে চেয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন বারে বারে। প্রভু মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তাঁর প্রিয়াকে।

অনেক কষ্টে দুটো চোখ মেলে তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর প্রাণবল্লভের পানে। তার পরে কম্প্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ওগো, আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলো, তুমি নাকি তোমার দাদার মত আমাদের ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে?'

প্রভুর দেহটি থর থর করে কেঁপে উঠল। একথা কেমন করে বিষ্ণুপ্রিয়া জানতে পারল। তিনি যে একথা গোপন রাখতে চেয়েছেন। এখন কি বলে প্রবোধ দিবেন তিনি তার বিষ্ণুপ্রিয়াকে? ছলনাময় অবশেষে ছলনার আশ্রয় নিলেন। আরো নিবিড়, আরো

গভীর আলিঙ্গনে প্রিয়াকে আবদ্ধ করে তার চিবুক ধরে মিথ্যা হাসি হেসে বললেন, 'কে তোমাকে এ কথা বললে? ও কিছু না। সব মিছে কথা।'

'আমার মাথার দিব্যি। সত্যি করে বল।'

হেয়ালীর মত বললেন গৌরসুন্দর, 'বললাম তো।'

বুঝিবা একটু আশ্বস্ত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

এবারে ধীর কণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া সুধালেন প্রভুকে, 'তুমি নাকি মাকে অকূলে ভাসিয়ে যাবে?'

নিমাই একটু মুচকি হাসলেন। সত্য গোপন করতে ছলনাময় চিরদিনের পটু। তাই সহজ সরল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'কেন অকারণ দুঃখ পাচ্ছ? এ কথা তোমাকে বলল কে?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার তো কিছু অজানা নেই। কিছুতেই তিনি ছাড়ছেন না প্রভুকে। নিমাইয়েব হাতখানা ধরে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'আমার মাথা খাও ঠিক কথা বল।'

নিমাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'কত দিন পরে তোমার দেখা পেলাম, এখন তোমার চাঁদমুখ দেখব, না কেবল কান্না কাটি করব। যখন যেখানে যাব, তোমার অনুমতি না নিয়ে যাব না। এখনও সব ভুলে যাও।'

সোহাগের স্পর্শে প্রিয়ার প্রাণ মধুর মাধুরীতে ভরে তুললেন গৌরসুন্দর। এ এক প্রণয়-মুগ্ধ রজনী। এমন রাত প্রিয়ার জীবনে আর আসেনি কখনো। চৌদ্দ বছরের যৌবনা তন্বী প্রভুর মুখোমুখী বসলেন তাঁর রূপের অঞ্জলি সাজিয়ে। বুঝিবা মদন মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এ যে ভুবন ভুলান রূপ। নয়ন লোভন কান্তি। যৌবনের জোয়ার দেহের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে। আনিতম্ব কেশগুচ্ছ। লোভনমধুর জঙ্ঘা। সুডৌল স্তন। যেন চন্দ্র বিভায় বিভাসিত উন্নত নাসা। রেখায়িত ললাট। প্রিয়া আজ সত্যিই গৌর-প্রিয়া হয়েছেন। ধীরে ধীরে প্রসারিত করে

দিলেন ছুটি মৃণাল বাহু। তাঁকালেন আঁখিতে আঁখি রেখে। আবদ্ধ করলেন গৌরগুণমণিকে কবোষ্ণ বক্ষে। যৌবন সম্রাট উপনীত হলেন একটি খরস্রোতা নদীর উপকূলে। স্তন হতে স্তনান্তরে টেনে নিলেন প্রিয়া তাঁর একান্ত আপন জনকে। এই তো মঙ্গল কুম্ভ। দেহ-মন্দিরের প্রবেশ পথ। উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করলেন সজোরে। অধর যুগলে রাখলেন আত্ম মদিরার অশেষ আকুলতা। উজার করে ঢেলে দিলেন সুধা সিন্ধু। প্রাণের রসে প্রেমের বন্ধনে ছুটি কুসুম ফুটে উঠল একটি বৃন্তে। এ যেন ভক্ত ভগবানের অভেদ মিলন। শ্রীরাধিকা আজ তাঁর কুঞ্জে প্রেমানুরাগে আবদ্ধ করেছেন কৃষ্ণকান্তকে। রসবল্লভের প্রীতি বর্ধন করছে রসবল্লভা। নদীয়াবিনোদ নদীয়াবিনোদিনীর সঙ্গে বিলাস বাসরে লীলামত্ত। এ রাত বিশ্ব-বন্দিত। এ রাত ভক্ত-নন্দিত। প্রিয়ার মনের দিগন্তে তখন শুধু একটি প্রার্থনা রণিত ধ্বনিত হচ্ছিল—এমনি করে আমায় চিরদিন বক্ষে ধরে রেখ!

আনন্দ-অবশ দেহ। কে যেন ছড়িয়ে দিল ক্লান্তির মাদকতা। ঘুম এল। কখন যেন নিদ্রায় নেশায় ডুবে গেলেন প্রিয়া।

গভীর রাত। হঠাৎ জেগে উঠলেন প্রিয়া। বিস্ময়ে বিমূঢ়া। হাহাকার করে উঠল অন্তর—'এ কি! তুমি কাঁদছ কেন?'

চমকে উঠলেন প্রভু, 'না তো। কাঁদছি কই? এই তো দিব্যি হাসছি!'

তাড়াতাড়ি নিজেকে নিজে সামলে নিলেন গৌরসুন্দর। মুখে আনলেন কৃত্রিম হাসি। কিন্তু ব্যর্থ হল সব চেষ্টা। স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রিয়ার চোখের সামনে একটি অমঙ্গলের অশুভ ইঙ্গিত—'আর আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা কর না। বল, সত্যি করে বল, কেন তুমি কাঁদছ?'

আনত মস্তক। কণ্ঠ আড়ষ্ট। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন প্রভু, 'যা শুনেছ সব সত্যি প্রিয়ে। আমি বৃন্দাবনে যাব কৃষ্ণ-সন্ধানে।'

যেন একটি বজ্র সম্পাত হল। চিৎকার করে উঠতে চাইলেন প্রিয়া। কিন্তু তাঁর কণ্ঠ যে রুদ্ধ। বাক্য স্ফুরিত হচ্ছে না। এতক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁর দেহ পল্লবে অবাধ্য-নর্তন। অধর সম্পুটে ঘন ঘন কম্পন। হৃদয় নিংড়ে যেন অশ্রুর উজান বেরিয়ে আসতে চাইছে। হতাশার সুরে শুধু বলতে চেষ্টা করলেন, 'তুমি স-ন্ন্যা-স-নে-বে!'

আর কোন কথা নেই। মূর্ছিত হয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর সুন্দরের কোলের মধ্যে।

'প্রিয়া! বিষ্ণুপ্রিয়া!'

না। কোনো সাড়া নেই। রাত্রির মত নিথর। পাষাণের মত স্তব্ধ।

'হায়, হায়, এ আমি কি করলেম!'

গৌরসুন্দরের কণ্ঠে খেদোক্তি। প্রিয়ার মুখের কাছে মুখ নিলেন প্রভু। ডাকতে লাগলেন প্রাণের সুরে, 'ওঠো, ওঠো প্রিয়া! চোখ মেলে তাকাও। আমাকে এত বড় আঘাত তুমি দিও না। শোন, আমার কথা শোন।'

এমনি করেই বুঝি একদা বেজেছিল ব্রজেন্দ্র নন্দনের বাঁশরী— 'রাধা রাধা বলে।'

আকুল কণ্ঠের ডাকে ফিরে এল প্রিয়ার জ্ঞান। ঢুলু ঢুলু অশ্রুসিক্ত দুটি নয়নে প্রত্যক্ষ করলেন গৌরসুন্দরকে। ধীরে ধীরে উঠলেন। বসলেন তাঁর প্রাণ-প্রিয়র মুখোমুখী। আজ আর দ্বিধা নয়। দ্বন্দ্ব নয়। বোঝাবুঝির পালা। শচীদেবী একদিন প্রিয়াকে বলেছিলেন, 'ওরে তোর নিজের জিনিষ বুঝে নে।'

আজ সেই লগন সমাগত। কিছুতেই আজ তাঁর কথা ভুলবেন না বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন প্রভু, 'আর কিছু লুকাব না তোমাকে। আমি যাব আমার কৃষ্ণের সন্ধানে। এতে আমার ও তোমার দুয়েরই মঙ্গল প্রিয়ে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, 'তোমার কৃষ্ণ আছে। কিন্তু আমার থাকবে কি ?'

'কেন ? তোমার কৃষ্ণ আছেন।'

'কৃষ্ণ! না, না, না। আমি কৃষ্ণ চিনি না। কতদিন কত রাত তোমার কৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছি। আকুল হয়ে তাঁকে খুঁজেছি। কিন্তু কি দেখেছি জান ? দেখেছি তোমাকে। আমার কৃষ্ণ, আমার বিষ্ণু তুমি, তুমি, তুমি। আমি অন্য কৃষ্ণ চাই না।'

প্রভু কিছুতেই পারছেন না বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্ত করতে। পারছেন না তার অনুমতি আদায় করতে। কি করে যাবেন তিনি। প্রিয়ার অনুমতি না পেলে যে যেতে পারবেন না তিনি। তাই তো প্রভুর এত ছলনা। এত ক্রন্দন-কীর্তন। বললেন এক সময়ে, 'প্রিয়ে, তোমার নাম না বিষ্ণুপ্রিয়া ? এবারে সার্থক করে তোল তোমার নাম। আর কোন চিন্তা নয়। কৃষ্ণকে ডাক। কৃষ্ণকে ভজনা কর।

'কিন্তু যেতে যেতে তোমার পায়ে যদি কাঁটা ফোটে ? যদি রক্ত ঝরে ? যদি ক্লান্তিতে শ্রান্ত হয়ে পথে প্রান্তরে ঘুমিয়ে পর! যদি ঘর্মাক্ত হয়ে যায় অমন সোনার অঙ্গ ?

বল, বল, কে মুছিয়ে দেবে পায়ের রক্ত, আর দেহের ঘাম। ক্ষুধা পেলে কে মুখের কাছে তুলে ধরবে দুটি অন্ন—ব্যঞ্জন ?'

চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল জলে। শ্রীমতীর দুঃখের নদীতে ডেকেছে বেদনার বান। অভিমানে ভেঙ্গে পড়েছেন প্রিয়া। আঘাত করে চাইছেন আরো কাছে টানতে। এ যে প্রেমের আঘাত। প্রীতির তিরস্কার।

প্রভু অটল। কোনো রাগের চিহ্ন নেই মুখে। বারে বারে ফেলছেন প্রিয়া দীর্ঘশ্বাস। নানা কথার ছলে চাইছেন প্রভুকে বাঁধতে, 'লোকে তোমাকে অপবাদ দেবে। বলবে, মা-বউকে ছেড়ে তুমি গিয়েছ। এ আমি কেমন করে সইব বল ?'

একটু নীরব থেকে আবার বললেন, 'না হয় আমিই চলে যাই বাবার বাড়িতে। তবুও তুমি থাকো। তুমি যেও না। তুমি কি বোঝনা, তুমি সন্ন্যাস নিলে মা কি করে বাঁচবেন?'

স্পষ্ট একটি প্রত্যুক্তি, 'মা যে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন প্রিয়া।'

'কি বললে?'

'মা অনুমতি দিয়েছেন?'

প্রভু শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। জীবের কল্যাণে তিনি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া।'

মাথা নত করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়া—মা অনুমতি দিলেন! তবে আর কি বলব! মুহূর্তে যেন পৃথিবীটা শূন্য মনে হতে লাগল। পায়ের নীচের মাটি যেন আর মাটি নেই। টপ টপ করে চোখ থেকে জলের ফোটা পড়তে লাগল।

প্রভু এবারে ধারণ করলেন অন্যরূপ। অন্য মূর্তি—

আপনি ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥ চৈঃ মঃ

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী বিষ্ণুরূপ ধারণ করলেন গৌরসুন্দর। আনন্দে অধীর প্রিয়া। অন্তর নৃত্য করে উঠল। মুগ্ধ হলেন অমন রূপ দর্শনে। প্রণাম জানালেন ভক্তি বিনম্র চিত্তে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভ্রম কাটল—'না না। এরূপ আমি চাই না। তোমার ঐশ্বর্য মূর্তির প্রয়োজন নেই। ওরূপ আমার ভাল লাগে না। স্বামীই আমার আরাধ্য দেবতা। কোথায় তিনি? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে এনে দাও।'

আকুল বিষ্ণুপ্রিয়া। লুটিয়ে পড়লেন বিষ্ণুর চরণ প্রান্তে। এ যে গৌরসুন্দরের বিলাস মূর্তি। এ ঐশ্বর্যেও পারলেন না তিনি প্রেমময়ীর প্রাণ গলাতে। কি করে পারবেন? বিষ্ণুপ্রিয়া কি যে

সে? তিনি যে গৌর বক্ষ বিলাসিনী। হ্লাদিনী শক্তি। প্রেমের ঘনীভূত প্রতিমূর্তি। তিনি তো ঐশ্বর্যের উপাসিকা নন।

এবারে সহজে নেমে এলেন প্রভু। পরাভব মানলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বলতে লাগলেন প্রসন্ন কণ্ঠে, 'প্রিয়তমে, তুমি ধন্য। ধন্য তোমার ভক্তি ও পতিপ্রেম! প্রিয়া, আমার অন্তরে তোমার চির-বসতি। লোকে জানবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করে চলে গেছি। কিন্তু তুমি থাকবে চিরদিন আমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে। তুমি যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তোমার সে ডাকে তখনই সাড়া দিয়ে দেখা দেব।'

বিহ্বলা বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকিয়ে আছেন মন্ত্রমুগ্ধার মত। তন্ময় হয়ে গিয়েছেন তিনি। প্রভু এক সময়ে ডাকলেন, 'প্রিয়া!'

তাকালেন দুটি মায়ামাখা চোখ তুলে বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভু বেদনা-করুণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'প্রিয়া, এ জীবনে শুধু দুঃখই হল আমার একমাত্র সঙ্গী! কত কাঁদলেম। কেঁদে কেঁদে নিজেকে উজার করে দিলেম। তবুও জীব নিলে না কৃষ্ণনাম।'

বেদন-শান্ত বিরহ-বিধুর গৌর-তনু যেন পাণ্ডুর হয়ে গেল। বড় দুঃখে তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রিয়া তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না। তোমাকে কাঁদাবার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করব। তুমি কেঁদে জীবকে কাঁদাবে। তোমার কান্নায় জীবের সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। একা আমার কান্নায় হল না। তাই তো তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমরা আমাকে একটুও কিছু দিবে না?'

নিস্তব্ধ বোবা রজনীও বুঝি তখন একবার আর্ত চীৎকার দিতে চাইল। বাতাসের ঘন নিস্বন বুঝি বা নিথর হয়ে গেল। প্রকৃতি হাহাকার করে উঠল। সুরধুনী থমকে দাঁড়াল। এ যে বড় মর্মান্তিক! বড় বেদনাবহ!

কবরীর বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছে। বিস্রস্ত কেশ। স্খলিত

বাস কম্প্রমান হৃদয়। কি আর বলবেন বিষ্ণুপ্রিয়া? কি আছে বলবার? হৃদপিণ্ড নিজহাতে উপড়ে দিতে জগতে কেই বা চায়? আর কে তা পারে?

বিষ্ণুপ্রিয়াকে আজ যে তাই করতে হবে। নীরবে বসে বসে কাঁদছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভুর নয়নেও জল। অনেক কষ্টে প্রিয়াকে বলতে লাগলেন প্রভু, 'যে কাজ নিয়ে এসেছি, তা যদি না করতে পারি, তবে .য আমার অমঙ্গল হবে। জীবের অমঙ্গল হবে। জীবের দুঃখে আমি যে আর স্থির থাকতে পারছিনে। তুমি না আমার সহধর্মিনী? আমার এ ধর্ম কাযে তুমি আমাকে সহায়তা কর প্রিয়া!'

প্রিয়াব অন্তর বীণার তারগুলো একসঙ্গে একবার ঝংকৃত হয়ে উঠল। জলে ভেজা আঁখি দুটি দিয়ে প্রভুকে প্রত্যক্ষ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'তুমি বলছ? সন্ন্যাস নিলে তোমার মঙ্গল হবে? জীবের সব পাপ ধুয়ে যাবে? জীবের মঙ্গল হবে?'

আড়ষ্ট কণ্ঠে প্রভু বললেন, 'হ্যাঁ প্রিয়া, সতি৷ জীব মুক্তি পাবে। তাদের মঙ্গল হবে।'

নিরন্ধ্র অন্ধকারের মত নিথর নিস্পন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া৷ ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন পাষাণ প্রতিমার মত। একটি দীর্ঘশ্বাস। কয়েক ফোটা চোখের জল। তারপরে শোনা গেল একটি ক্ষীণ করুণ কণ্ঠ, 'হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি ইচ্ছাময়।...তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে, 'এ জনমে কাঁদতে এসেছিলাম। কেঁদেই কাল কাটাব। দুঃখিনী দাসীকে এ দুটি চরণ সেবার অধিকার জনমে জনমে দিও। এই আমার শেষ নিবেদন প্রভু।'

'বধু কি আর বলিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে

প্রাণনাথ হইও তুমি।'

আশীর্বাদ করলেন মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তিনি আজ মায়া-মুক্ত। আর কোন অন্তরায় রইল না। আনন্দ-শান্ত গৌরসুন্দর বলতে লাগলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে, 'বিষ্ণুপ্রিয়ে, কলিহত জীবের পরিত্রাণের জন্য আজ যে উপকার তুমি করলে, চিরদিন তা সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে ভক্তদের হৃদয়ে··· শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

অকাতরে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সব কিছু ইন্ধন দিলেন।

জীব-জীবনে শিব-সন্তোষের জন্য প্রিয়া তাঁর প্রিয়বস্তু বিসর্জন দিতেও কসুর করলেন না। প্রভু ধীরে ধীরে প্রিয়ার চোখ দুটি মুছিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, 'কেঁদো না প্রিয়া। তোমার চোখে জল দেখলে আমি বড় ব্যথা পাই। কথা শোন, মায়ের কাছে বলেছি, আরো কিছুদিন সংসারে থেকে তোমাদের সুখী করব। তোমাদের না বলে আমি যাব না।'

প্রিয়ার কনক অঙ্গ কালো হয়ে গিয়েছে দুঃখের দহনে। অন্তরানলের দাহ বড় বেদনাবহ। কিন্তু তবুও তার মধ্যে একটু আনন্দ, একটু শান্তির সন্ধান করেন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর আশ্বাসে। আরও কিছুদিন থাকবেন তিনি সংসারে। না বলে যাবেন না তিনি। যাবেন না পালিয়ে। সবাইকে বলে কয়ে বিদায় নেবেন প্রভু। এই সামান্য সান্ত্বনাটুকুই আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার একমাত্র সম্বল।

ধীরে ধীরে তন্দ্রা নেমে এল বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন, ফুলের মত মুখখানা গৌরসুন্দরের বক্ষমাঝে রেখে। নিষ্করুণ একখানা মূর্তি। কোথাও কোনো মালিন্য নেই। কেবল কয়েকটি বেদনার রেখা প্রস্ফুট হয়ে রয়েছে ললাট ফলকে।

॥ আঠার ॥

ভগবানের সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম করেন ঈশান আর গোবিন্দ। ওরা গৌর-মন্দিরের সেবায়েত। তত্ত্বতালাশির ভার দামোদর পণ্ডিতের'পর। সব কিছু দেখা শোনা করবার দায়িত্ব তাঁর। নির্মল নিখুঁত কাজ কর। মার্জন রক্ষণ কর গৌর-মন্দিরের অঙ্গণ প্রাঙ্গণ। কোথাও যেন থাকে না বিন্দু অপরিপাট্যতা।

সুখ দুঃখের মাঝ দরিয়ায় শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া দোলায়িতা। কখনো আনন্দ, হর্ষ, তৃপ্তি ও তন্‌হা। আবার কখনো বিষাদ, বেদনা, দুঃখ ও ক্রন্দন। তবে এখন আর কান্নাকে ধরে রাখেন না তাঁরা। সে অধ্যায় সমাপ্ত। গৌরসুন্দর তা এক রকম চুকিয়ে দিয়েছেন। আদেশ, মতামত সব কিছু নিয়ে প্রভু এখন নৃত্য কীর্তনে মাতোয়ারা। শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়ারও আনন্দের সীমা নেই। উৎসবের পর উৎসব। গৌর-মন্দিরে উৎসব লেগেই আছে। প্রভু এখন ঘরেই থাকেন। মা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর প্রিয় পরম সান্নিধ্যের ছোঁয়ায় উজ্জীবিত করে তোলেন। থাকেন তাঁদের কাছে কাছেই।

এমনি করে কেটে গেল দেড়টা মাস। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আজ। মাঘ মাস। লোকে বলে ভাল দিন। ভোর হল। শয্যাত্যাগ করলেন প্রভু। সমাধা করলেন প্রাতঃকৃত্য। বললেন ডেকে মাকে, 'আজ বড় ভাল দিন মা। বেশ করে ভোজন করিয়ে দাও বৈষ্ণবদের।'

চলল বৈষ্ণব ভোজনের আয়োজন। সকাল থেকে কাজে লেগে গেছেন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। হাতে হাতে কাজ করে

যাচ্ছেন দুজনে। ঈশান আর গোবিন্দ দিচ্ছেন যোগান। প্রভুর আজ আনন্দের সীমা নেই। তিনি যেন ভাসছেন ভাবের সাগরে। ভক্তরাও দলে দলে আসছেন। ভাল দিন, তাই প্রভুর চরণ-ধুলি নেবার এ অদম্য প্রয়াস। সকল ভক্তের হাতেই ফুলের মালা। ফুল বড় প্রিয় প্রভুর। তাছাড়া আরো কতকিছু ভক্তবৃন্দ নিয়ে আসতে লাগলেন। যে এসে প্রণাম করেন, তাকেই প্রভু বলেন, 'তোমরা কৃষ্ণের ভজনা করো। তাতেই আমার সন্তোষ হবে।'

ভক্তগণ প্রণামান্তে প্রভুর পানে তাকিয়ে আছেন। প্রাণভরে দেখছেন গৌর অঙ্গের তনুভা। তার পরে চলে যাচ্ছেন কীর্তনের অঙ্গনে।

আজ বড় আনন্দের দিন। সকাল থেকেই কীর্তনের আবেশে ভাবমত্ত ভক্তবৃন্দ। দর্শন করছেন তাঁদের প্রিয় প্রভুকে। অপূর্ব বস্ত্র পরিধান করেছেন গৌরসুন্দর। গলায় পরেছেন ফুলের মালা। তারপর ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে বহির্গত হবেন নগর কীর্তনে। মনের মানুষটিকে মনের মত করে সাজাচ্ছেন গদাধর। গলায় পরিয়েছেন মালা। চন্দন বিন্দু একে দিয়েছেন ললাটে। এ অঙ্গ-অর্চনা থেকে আর যেন মুক্তি চাইছে না গদাধরের মন। তাই সাজান শেষ হচ্ছে না কিছুতেই। অবশেষে বললেন এক সময়ে প্রভু, 'গদাধর, বেলা যায়!'

সত্যি বেলা বয়ে যায়। সময় তো আর নেই। আজ নদীয়া-জীবন গৌরসুন্দর তাঁর সাধের নবদ্বীপকে শেষ বারের মত দেখে নেবেন। তাই তো এ তাড়া। তাই তো এ ত্রস্ততা।

কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেউ কিছু বোঝে না। যে যার মত ভেসে চলেছেন আনন্দ লহরিতে।

'নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥

পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন ॥'

ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে রসে কীর্তনের তুফান তুলে দিলেন প্রভু নবদ্বীপের পথে প্রান্তরে। অনুরাগীদের সঙ্গে করলেন সাক্ষাৎ। দ্বারে দ্বারে কড়া নাড়লেন। সন্ধ্যায় ফিরে এলেন তাঁর বাল্যের স্মৃতি বিজড়িত সুরধুনীর তট-তীর্থে। থমকে দাঁড়ালেন গৌরসুন্দর। আকাশে বাতাসে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গৌর-বিরহ বিধুর ক্রন্দন। গঙ্গার বুকে মর্মচ্ছেদী কলতান। মনে মনে একবার প্রণাম জানালেন প্রভু। দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল। অতি সাবধানে গোপন করলেন তা। কেউ কিছু দেখতে পেল না।

প্রায় একটি প্রহর হল অতিক্রান্ত। ফিরে এলেন প্রভু ঘরের পথে। আজ মহাযোগ। গৌর-দর্শণের মহাযোগ। দলে দলে সবাই আসতে লাগল। সাধন-পরায়ণ মনের দিগন্তে ছায়া পাত হয়েছে গৌর-বিরহ বিচ্ছেদ সন্ধ্যার। গৌরাঙ্গই বুঝিবা টেনে আনছেন শেষ দর্শনের অভিলাসে সবাইকে কাছে। শেষ দর্শন আর শেষ কথা। আজন্মের মত রেখে যাবেন নদীয়াবাসীর কানে তাঁর শেষ বাণীটি। এ তো বাণী নয়, মন্ত্র। তাই তো গৌরসুন্দর তাঁর অনুরাগীদের সম্বোধন করে বললেন, 'বন্ধুগণ, আমাকে তোমরা যদি একটুও ভালবেসে থাক, তাহলে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা তোমাদের কাছে, তোমরা কৃষ্ণ ভজনা করতে ভুলো না।'

কথাগুলো বলতে বলতে গৌরকণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে এল। চোখের তারায় সাগর সোহাগ। গোপনচারী গৌরাঙ্গ সব কিছু লুকালেন। কেউ বুঝতে পারল না বিদায় বিধুর বারতা।

ঠিক এমনি এক মগ্ন মুহূর্তে ধীর পদপাতে হাতে একটি কচি লাউ নিয়ে এসে দাঁড়াল একটি লোক। বড় কাঙাল সে। ছিন্ন বসন পরনে। তৃণাদপির মত সুনীচ। নম্রতায় নত। চোখ দুটি অশ্রু-সিক্ত।

দীনের দয়াল দীনবন্ধুর দৃষ্টি যে দীনের দিকেই সদা প্রধাবিত। তাই তো আকুল করা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন প্রভু, 'কে? আমার শ্রীধর? বেশ চমৎকার লাউ এনেছ তো। কোথায় পেলে?'

শ্রীধর দরিদ্র। তার দেবার মত কিছু নেই। বিদুরের ঘরে ক্ষুদ খেতে গিয়েছিলেন ভগবান। এও তো তাই। শ্রীধর সেই ভরসায় বুক বেঁধে অতি সন্তর্পণে নিয়ে এসেছেন নিজের গাছের কচি লাউটি কেটে। শ্রীধরের বড় ইচ্ছা, প্রভু এ সামান্য দান গ্রহণ করুন।

প্রাণের কথা শোনেন প্রাণের জন। এ যে ঐকান্তিকতার অশ্রুসিক্ত উপচার। প্রভু কি তা গ্রহণ না করে পারেন? তাই তো মাকে ডেকে বললেন প্রভু, 'এ লাউ দিয়ে পায়েস রান্না কর মা। ভক্তগণও প্রসাদ পাবে ঠাকুরের।'

শ্রীধরের পানে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও বস শ্রীধর। প্রসাদ পেয়ে বাড়ি যাবে।'

সার্থক হয়েছে শ্রীধরের মনের বাসনা। প্রভু আগ্রহ ভরে গ্রহণ করেছেন শ্রীধরের সামান্য দান। তাছাড়া এ কাঁচ লাউয়ের পায়েসই হল গৌরসুন্দরের ভোজনের শেষ উপচার। গার্হস্থ্য জীবনের ভোজের আসর এই তো শেষ। শচীমায়ের সঙ্গে গল্প করছেন আর খাচ্ছেন প্রভু। বেশ আনন্দের মধ্য দিয়ে হয়ে গেল খাওয়া দাওয়া।

রাত নেমে এল ধীরে। বিদায় নিয়েছেন ভক্তগণ। নিত্যকার মত আজও নিমাই শয়ন কক্ষে যাবার আগে প্রণাম করলেন মাকে। বুঝিবা থর থর করে কেঁপে উঠল একবার হাতখানা। অন্তর নিবেদন করল অরুন্তুদ আর্তি—তোমার অধম সন্তানকে ক্ষমা করো মাগো। ঐ চরণ ধুলো আমার পথের পাথেয়।

শয়ন কক্ষে এলেন প্রভু। ক্ষণ বিরতি। বিষ্ণুপ্রিয়া ঢুকলেন। সুগন্ধি পান সেজে এনেছেন। আর এনেছেন চন্দন, কুঙ্কুম।

পানটি প্রভুর মুখে পুরে দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তৃপ্তির সু-গহনে এ যেন একটি প্রস্ফুট পদ্ম। গৌর-সরোবরে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা প্রিয়া বললেন মৃদু মধুর হেসে, 'যদি অনুমতি দাও তো আজ আমি তোমাকে মনের মত করে সাজাব।'

প্রসন্ন একটি প্রত্যুত্তর, 'তোমার জিনিস তুমি সাজাবে, আমি কেন বাধা দেব?'

একটু নীরব থেকে আবার বললেন প্রভু—'কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি কথা দিতে হবে।'

—'কি কথা?'

'আমিও তোমাকে সাজাব। বল, অমত করবে না?'

'পুরুষ মানুষ আবার সাজাতে জানে নাকি?'

'দেখো।'

'আচ্ছা দেখা যাবে।'

প্রাণ-প্রতীম গৌরাঙ্গ সজ্জিত হবে আজ গৌরাঙ্গীর অঙ্গঅলঙ্কারে। রাস রসিকেন্দ্র আজ প্রীতি বিধান করবেন নদীয়া বিনোদ গৌর নটবরের।

॥ উনিশ ॥

গভীর রাত।

নদীয়া নগর নিস্তব্ধ। কোথাও কিছুর সাড়া নেই। শুধু শোনা যাচ্ছে শৃগালের নিশীথ চীৎকার। আর ভেসে আসছে প্রণয়কাতর দু একটি নৈশ বিহগের কণ্ঠস্বর।

আকাশ নীল। তার স্বচ্ছ সামিয়ানায় দপ দপ করে জ্বলছে তারাদের তিতিক্ষিত আঁখি। তারা যেন প্রতীক্ষায় অধীর। বিশ্বমোহন আজ ধারণ করবেন বিশ্ববিমুগ্ধ রূপ।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবারে বসলেন তাঁর মনের মানুষটিকে মনের মত করে সাজাতে. মালতীর মালা পরিয়ে দিলেন কণ্ঠে। চন্দনে অনুলিপ্ত করলেন সোনার অঙ্গ। সুগন্ধি তিলকে শোভাময় করে তুললেন সুপ্রসস্ত ললাট। প্রেমময়ের পরশে প্রেমময়ী মগ্না। আনন্দচঞ্চলা। প্রাণে প্রাণে চলেছে নিভৃতে নীরব আলাপন। প্রতিটি অঙ্গ যেন প্রতিটি অঙ্গের জন্য আকুল হয়ে উঠল। চার চোখের মিলনে উভয়েই বিমুগ্ধ। প্রিয়াকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন প্রভু। আদরে, সোহাগে, চুম্বনে, আশীষে ভরে তুললেন তাঁকে।

এবারে প্রভুর পালা। এমন মন হরণ রূপ যাঁর তাঁকে তিনি কোন উপাদানে সাজাবেন?

বিষ্ণুপ্রিয়ার সলজ্জ মুখখানা একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত দুটি করপল্লবে ধারণ করলেন। সোহাগ ভরে করলেন একটি মৃদু চুম্বন। বসলেন তাঁকে সাজাতে।

দীর্ঘ কালো কেশে বাঁধলেন একটি কবরী। মতির মালা পরিয়ে দিলেন কণ্ঠে। সিঁদুর বিন্দু এঁকে দিলেন ললাটে। সেই রক্ত-রাঙা সিঁদুর বিন্দুর চতুর্দিকে দিয়ে দিলেন চন্দনের ফোঁটা। শুধু তা

কেন? খঞ্জন আঁখিতে আঁকলেন অঞ্জনের রেখা। 'অগোর কস্তুরী গন্ধ' মাখিয়ে দিলেন সযত্নে পীনোদ্ধত যুগল কুচে। কি অপরূপ রূপ শোভা! কাঁচুলি রচিত হল দিব্য বস্ত্রে। অঙ্গে অঙ্গে পরিয়ে দিলেন নানা ধরণের অলঙ্কার। বিষ্ণুপ্রিয়া ধারণ করলেন ত্রৈলোক্য-মোহিনী রূপ।

'কাঞ্চন বরণী ধনী নবদ্বীপময়ী।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর স্থখে গুণ গাই॥
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া।
সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া॥
নবীনা প্রিয়াজী, সবে যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগুধা ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পদ্ম গন্ধ বহে মরি স্থরস অধর।
দিবানিশি মত্ত তাহা গৌরাঙ্গ-ভ্রমর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশী গৌরাঙ্গ চকর।
যার রূপ স্থধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর॥
গৌর-প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া।
গৌর-বক্ষ বিলাসিনী দেহ পদছায়া॥'

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে মুগ্ধ। বারে বারে তাকাতে লাগলেন তাঁর পানে। প্রিয়া গর্বিতা। কিন্তু বড্ড লজ্জা করছিল তার। তাই লুকালেন গিয়ে গৃহ কোণে। দুজনে চলল রাত গভীরে লুকোচুরী খেলা। অবশেষে ধরা পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁকে যে ধরা পড়তেই হবে। কারণ নিজ বক্ষে ধারণ করবার জন্যই নিজ রুচিতে সাজিয়েছেন নিমাই তাঁর প্রিয়াকে। চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে—

'খঞ্জন নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম-কামানের গুণ করিলেক।।
অগোর কস্তুরীগন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিলা কাঁচুলী পর তেখে ।
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভরিলা তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহার অপার।।'

প্রভু মিষ্টি মধুর হেসে বলতে লাগলেন, 'কেমন সাজিয়েছি দেখো। আমার মনের মত সাজ।'

বিষ্ণুপ্রিয়া নতমুখে হেসে বললেন, 'তোমার এ গুণটি আছে জানলে, তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম। এখন থেকে তুমিই বেঁধে দিও আমার কবরী। আর কষ্ট দেব না কাঞ্চনাকে।'

'কাঞ্চনাকে এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করবে না?'

'সখীর কাছে আবার লজ্জা? তোমার সব কথা আমি কাঞ্চনাকে বলি জান?'

—'তাই নাকি!'

প্রভু যেন একটু লজ্জা পেলেন। কিন্তু তা ক্ষণিকের। প্রিয়ার রূপে আকৃষ্ট গৌর। অন্য কথা ভাববার সময় কোথায়? চৌদ্দ বছরের যৌবনা যুবতীর আকর্ষণ বড় দুঃসহ। চঞ্চল হয়ে পড়লেন গৌরসুন্দর। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্ফুট দেহ কোরকের গন্ধে মত্ত হয়ে উঠেছে গৌরভ্রমর।

ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপ নিরখে বদন।
অধর মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে।। চৈঃ মঃ

প্রেমমত্ত গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া। এই তো শেষ খেলা। তাই বুঝি গৌরসুন্দর রেখে যাচ্ছেন অশেষ আশীষ। দুজনেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

গৌরাঙ্গ প্রাণ উজার করে পান করছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অধর-সুধা। জড়িয়ে ধরছেন ক্ষণে ক্ষণে। তুলে নিচ্ছেন বক্ষে। নেবেনই তো। বিষ্ণুপ্রিয়া যে গৌরাঙ্গের বক্ষবিলাসিনী। তাই তো নানা রসে রসিক নাগর তাঁকে রসিয়ে তুলছেন। প্রিয়ার অথৈ প্রেম-সায়রেও ডেকেছে আজ বান। উত্তাল। প্রমত্তা প্রিয়া প্রভুর সঙ্গে বিলোল কটাক্ষে বিহ্বলা।

> সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ।
> মদন মুগধে দেখে রতির বিলাস॥
> হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
> পাশ পালটিতে নারে দোহে এ সজ্জা॥ চৈঃ মঃ

বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌরাঙ্গ টেনে নিলেন তাঁর আবক্ষ আলিঙ্গনের মধ্যে।

আনন্দে অবশ তনু প্রিয়াজীর। কনকলতার মত জড়িয়ে ধরছেন প্রভুকে। এই তো তাঁর স্বর্গ—মর্ত—পাতাল। এই তো তার ইহকাল আর পরকাল। এই তো তাঁর জন্ম জন্ম আরাধনার সুন্দর। প্রিয়া যেন উপচে পড়ছেন, 'নাথ আমি কোথায় আছি গো? এ কি সুখ না দুঃখ? এ কি গরল না অমৃত? আমি জ্ঞানে আছি না অজ্ঞানে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। তুমি আমাকে দৃঢ় করে ধর।'

প্রভু প্রিয়ার কোমল কমল বক্ষে রাখলেন তাঁর প্রশান্ত বক্ষ। অধরে রাখলেন অধর। নয়নে গেল নয়ন মিলে। দুটি দেহ একটি বৃন্তে ফুটে উঠল একটি ফুলের মত. এমন সুখ, এমন আনন্দ প্রিয়াজীর জীবনে এই প্রথম। এ রসের সংবাদ জানেন রসিক জন। তাইতো দেখিয়ে যাচ্ছেন গৌরসুন্দর তাঁর বিলাস মূর্তিটি। গৌরবিলাসিনী যে প্রভুর এই রূপ আস্বাদনের জন্যই অন্য দেহ ধারণ করেছেন। স্বরূপত দুই-ই এক। কেবল রস আস্বাদনের জন্য দুই রূপ। দুই তনু। উভয়েরই অন্তরে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।—

'একই অঙ্গে এতরূপ দেখিনি তোমার।' দুটি দেহ এক হয়ে গেল। দুটি মন কিন্তু রইল দূরে দূরে।

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোহে সুখে নিদ্রা যায়॥ চৈঃ মঃ

ধীরে ধীরে প্রভুর প্রশান্ত বক্ষে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

আর দেরী নয়।

এবারে এগিয়ে চল মন।

চল সীমা থেকে চলে যাই অসীমে। কান্না থেকে মেতে যাই কীর্তনে। একটুও বিলম্ব করিসনে। একটুও অবসর নেই। ডাক এসেছে। সেই পাগল করা বাঁশরী থেকে থেকে বেজে উঠছে। ঐ তো তাঁর পায়ের ধ্বনি। ঐ তো নুপুর নিক্কন। আর ঘরে নয়। বেজে উঠেছে প্রান্তরের সঙ্গীত। চল মন ছায়া থেকে কায়ায় চলে যাই। চলে যাই দয়া থেকে দর্শনে। আমি আমার কৃষ্ণ দর্শন করব। বৃন্দাবন ধামে যাব।

নিথর নিস্তব্ধ রাত্রি। দেখতে দেখতে তিনটি যাম হল অতিক্রান্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া অঘোর ঘুমে অচেতন। পাশের ঘরে নিদ্রিতা শচীদেবী। নিমাই ধীরে নয়, ত্রস্ততার সঙ্গে বসলেন উঠে। একবার তাকালেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুমন্ত মুখের পানে। শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর আরামের শয্যা-বিলাস। আর ঘরে নয। এবারে বিশ্ব অঙ্গনের অসীম বিস্তারে হবে পদ সঞ্চার।

যাত্রার মহা লগন সমাগত। প্রাণ ছেড়া সুর বাজছে কানে কানে। সদয় সমীর ঢেলে দিচ্ছে সুধা সঙ্গীত।

রাত্রির জঠরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেঁধে রেখে যেতে হবে বেদনার ক্রন্দনে। বারে বারে তাকাচ্ছেন তার মুখের পানে। পাশ বালিশটি তুলে আনলেন। রাখলেন প্রিয়ার কোলের মধ্যে। ওখানে ঐ আতপ্ত বক্ষের মাঝে নিমাই এতক্ষণ ছিলেন নিদ্রিত।

একখানা পা ছিল প্রিয়াজীর প্রভুর পায়ের উপর। অতি সন্তর্পণে দিলেন তা নামিয়ে। সেখানেও একটি উপাধান দিলেন গুজে। আবার তাকালেন প্রিয়ার মুখের পানে। শেষ দেখা দেখে নিচ্ছেন প্রভু। দেখে নিচ্ছেন তাঁর প্রাণ প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে। এ যে সৌন্দর্যের মধুমন্থ বৈভবোজ্জ্বল একখানা চন্দ্রানন। ছোট্ট করে ঐ রক্তিমাভ অধরে একটি দহন সিক্ত চুম্বন করলেন প্রভু। তার পরে শয্যা থেকে নেমে এলেন নীচে। খুলে দিলেন দরজার খিল। ঘরে বাইবে বিসারিত করে দিলেন দৃষ্টি। আবার তাকালেন প্রিয়ার পানে ফিরে। অস্ফুটে বললেন—'বিষ্ণুপ্রিয়া গো, আমি চলে যাচ্ছি। একান্ত অসহায় মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো।'

শেষ প্রণয় সম্ভাষণ নিবেদন করলেন নিমাই তাঁর দাম্পত্য জীবনের। বাইরে এলেন নিমাই। নির্বাপিত হল প্রিয়ার ঘর থেকে গৌর দীপ শিখাটি। এ শিখা আর জ্বলবে না। কেউ আসবে না এ আলো জ্বালাতে—

'নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীরাম চরণে।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে॥
বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া।
বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া॥' চৈঃ মঃ

বসন ভূষণ সব খুলে রাখলেন প্রভু। পরলেন ছিন্ন কন্থা। নগ্ন চরণ। আবরণ হীন দেহ। স্পন্দিত বক্ষ। স্মরণ করলেন স্বর্গত পিতাকে। প্রনাম জানালেন ভক্তি বিনম্র চিত্তে। এগিয়ে গেলেন নিদ্রিতা জননীর দ্বার-প্রান্তে নমস্কার করলেন। দু ফোটা জল বেরিয়ে এল চোখ থেকে। মনে মনে বললেন—মা যাই।

দাদা বিশ্বরূপ এসে যেন ছায়ার মত সঞ্চারিত হলেন মনের নেপথ্যে। আনত হল মস্তক। তারপর? তারপরে তাঁর বহুস্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তাঁর সেই

কৈশোরের কুঞ্জবন এবং যৌবনের কীর্তন-তীর্থের কথা। প্রণাম করলেন গৌরসুন্দর, প্রণাম করলেন জননী জন্মভূমির উদ্দেশ্যে। বললেন,—বিদায়! বিদায়! বিদায়!

ব্যথাতুরা আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। চিৎকার করে উঠল পাখীরা আর্তকণ্ঠে। মর্মরিত হয়ে উঠল বনকান্তার। শীত-শান্ত গঙ্গার কতগুলো ক্ষ্যাপা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল তটের বুকে। নিমাইর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হল—হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

আর কিছু নেই। সব হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্তে। সেই মায়ের অশ্রুধার, প্রিয়ার ক্রন্দন-কণ্ঠ, ভক্তদের সম্মেলন। আর প্রতিষ্ঠার পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা নেই। নেই, নেই, কিছু নেই! অশান্ত, অধীর, উদভ্রান্ত নিমাই ত্রস্ত পদ সঞ্চারে ছুটে এলেন গঙ্গার তীরে। হিম নির্ঝরিত রাতের শীতার্ত সুরধুনীর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিমাই। যেন একটি জ্যোতির্মণ্ডল এগিয়ে চলল গঙ্গার বুকে ভেসে ভেসে। চলে এলেন এপারে। উঠে দাঁড়ালেন ক্ষণকাল। দৃষ্টি বিসারিত করে দিলেন ওপারের দিকে। বুঝি বা আর একবার দেখে নিলেন তাঁর বড় সাধের নবদ্বীপকে। ক্ষীণতম মায়ার ছায়াপাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অনুরণিত হয়ে উঠল নুপুর নিক্কন। বাঁশী বেজে উঠল মধুর সুরে। কৃষ্ণ প্রেমের সায়রে প্রস্ফুটিত হল একটি কৃষ্ণ কমল। নিমাই পাগলের মত ধেয়ে চললেন। কণ্ঠে তাঁর শুধু একটি নাম—হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

দ্রুততর হল পদপাত। নিশীথ রাত্রির নিথর আঁধার চিরে চলেছে একটি বিরাট আলোক মণ্ডল। ছুটে চলেছে কাটোয়ার পথে।

'শয়ন মন্দিরে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, উঠিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐ ছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া, আইলা সুরধুনী তীরে।

তুই কর জুড়ি,	নমস্কার করি,	পরশ করিল নীরে ॥
গঙ্গা পরিহরি,	নবদ্বীপ ছাড়ি,	কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন,	শুনি সব জন,	বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান,	হৃদয় কঠিন,	সেও শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে,	গলয়ে পাথরে,	এ দাস লোচন গায়॥'

বিদায় বিধুর নবদ্বীপ কি নিয়ে রইল? রাখল মহাপ্রভুর পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে। সেই থেকে এ ঘাটের নাম হল নিরদয়ের ঘাট।

'এ ঘাটে না আইজ হইতে
নিরদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে।'

বিষ্ণুপ্রিয়া তখনো গভীর ঘুমে নিদ্রিতা। কিন্তু তাঁর প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী দূর দিগন্তের আকাশে।

॥ কুড়ি ॥

হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুম গেল ভেঙ্গে।

পাশ ফিরলেন। শেষ রজনীর শেষ বিলাসের আশে হাত বাড়ালেন প্রভুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য।

কিন্তু কৈ ? এ যে শূন্য শয্যা।

চমকে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'ওগো, তুমি কোথায় গেলে ?'

কোনো সাড়া নেই !

কেবল টপ টপ করে পড়ছিল তখন পাতার 'পরে শিশিরের ফোটা।

শয্যা ছেড়ে নামলেন নীচে বিষ্ণুপ্রিয়া। এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়।

কেউ নেই। কিছু নেই। প্রিয়া প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি বাইরে গেছ ?'

না, এবারেও সাড়া নেই।

বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়ার।

'তবে কি, তবে কি তুমি –'

ছুটে গেলেন শচীদেবীর ঘরের কাছে। দরজা বন্ধ। বাইরে দাঁড়িয়ে আকুল কণ্ঠে ডাকলেন, 'মা ! মাগো !'

ধরমর করে উঠে বসলেন শচীদেবী, 'কে !'

কম্প্র কণ্ঠে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'শীগগির দরজা খোল !'

বিস্রস্ত বসন। খেয়াল নেই সেদিকে শচীদেবীর। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজা খুললেন, 'কি হয়েছে বৌমা ?'

কান্না করুণ কণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া সুধালেন, 'তোমার ছেলে কোথায় মা ?'

'সে কি !'

যেন বজ্রপতন হল শচীদেবীর মস্তকে। অবাক বিস্ময়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি বলছ বৌমা ! নিমাই ঘরে নেই ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি তিনি নেই।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তেলের প্রদীপটি জ্বালালেন শচীদেবী। বউমার হাত ধরে খুঁজতে লাগলেন সারাটা বাড়িময়। সহসা চোখে পড়ল নিমাইয়ের পরিত্যক্ত বসন। আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়লেন শচী, 'হায়, হায়, আমার বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেছে !'

অসহায় বৃদ্ধা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'বউ মা ! বউ মা !'

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখেও বাঁধভাঙ্গা অশ্রু। তখনো রাত ভোর হয় নি। কেউ নামে নি পথে। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এসে দাঁড়ালেন নির্জন ও নিস্তব্ধ পথের বাঁকে।

কি করবেন বৃদ্ধা জননী ! আর কি বা করবেন কিশোরী বধূ। কোথায় খুঁজবেন ? কোথায় যাবেন ? কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। অবশেষে শচীদেবী গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন তাঁর প্রাণের ধন নিমাইকে, 'নিমাই ! নিমাই !'

পথে পথে হাটছেন আর ডাকছেন আত্মদীর্ণ হাহাকারে, 'নিমাই ! নি-মা-ই !'

ডাকো। মাগো আকুল করা আর্ত ডাকে বিদীর্ণ করে দাও তাঁর অন্তর ! ডাকো সেই কনক কুসুমদীপ্ত তরুণ নিমাইকে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে শচীদেবী বানবিদ্ধা পাখীর মত চোখ তুলে তাকালেন। বললেন—'তুমিও ডাকো।'

'আমি কি বলে ডাকব মা ?'

তাকে প্রাণের ভাষায় ডাকো ! মনের ভাষায় ডাকো। অন্তরের অন্তস্থলে যে নাম আসে সেই নামটি ধরে ডাকো।

শচীদেবী তখনও ডেকে চলেছেন, 'নিমাই! নিমাই! নিমাই!'

না, না, না! কোনো সাড়া নেই! শব্দ নেই। শীত-স্নাত রাত্রির স্তব্ধতায় কে যেন চিৎকার করে উঠল—নাই! নাই! নাই!

জননী শচীর ক্রন্দনে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে ঈশানের। দরজা খুলে বাইরে নেমে উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন, 'মা, মাগো!'

'মা' ডাকশুনে শচীদেবী সেদিকে ধেয়ে চললেন শিশুহারা হরিণীর মত—ঐ, ঐ, ঐ বুঝি নিমাই ডাকছে!

এতক্ষণে ঈশান এসে পৌঁছে গেছেন শচীদেবীর কাছে। তাকে দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন শচীদেবী—'ও ঈশান! আমার নিমাইকে দেখেছ তোমরা? নিমাই কে?'

দুঃসহ রজনীর অবসান হল। ডেকে উঠল কাক। দু একটি মানুষ নেমেছে পথে। ঈশান ঘরে ফিরিয়ে আনল শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ওঁরা পাগলিনী। ওঁদের কেশবাসে অগোছাল ভাব। চোখ রক্তিম। সিক্ত। সারা অঙ্গ ধূলায় ধূসর।

প্রভাতে ভক্তবৃন্দ স্নান করতে আসেন গঙ্গায়। তাঁরা স্নানান্তে প্রণাম করেন প্রভুর শ্রীচরণে। কিন্তু শচীদেবীর আর্তকণ্ঠ তাঁদের মনে সঞ্চারিত করল বিষাদের ছায়া। তাড়াতাড়ি করে ভক্তবৃন্দ চলে এলেন শচীদেবীর বাড়িতে। এলেন খবর জানতে। শচীদেবী তাদের পানে তাকিয়ে আর্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন, 'আমার নিমাই কোথায়? তোমরা তাকে কেউ দেখেছ?'

নবদ্বীপ শোকাভিভূতা। আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে শ্রীবাস, নিত্যানন্দও বাসু ঘোষ। তাঁদের চোখ থেকে ঝরছে নীরব অশ্রু। শচীদেবী থেকে থেকে হাহাকার করে উঠছেন, 'ওগো নিতাই, তোমাদের ছাড়া তো হয়নি কোনদিন নিমাই। বল, কোথায়, কোথায় আমার নিমাই?'

একের পর এক সব সংবাদ শুনলেন ভক্তবৃন্দ। তাঁরা এক সঙ্গে বসে আলোচনা করতে লাগলেন—এখন কি করা যায়।

ও দিকে বিষ্ণুপ্রিয়া অন্দরে বসে কাঁদছেন। কত কথা মনে পড়ছে তাঁর। স্নান করতে গেলেন। হারিয়ে গেল নাকের বেশর। সারাটা দিন চোখের পাতা কাঁপল। অথচ এ অমঙ্গল চিহ্ন তখনকার মত মনকে স্পর্শ করেনি। মনে পড়ে, বাসর ঘরে যাবার পথে পায়ের আঙ্গুল কেটে যাবার কথা। কিন্তু তখন তো প্রভু হাত বাড়িয়ে ধরে ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বলেছিলেন,--'ও কিছু না। আমি তো আছি।'

সব আশ্বাস আজ মিথ্যা হয়ে গেল? কৈ, বলে গেলেন না তো! যাবার আগে জানিয়ে যাবেন বলেছিলেন। সে কথা তো রক্ষা করলেন না! তবে কি তিনি তাঁর অঙ্গীকারের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলেন? নানা ভাবনার মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। চমকে উঠলেন শচীদেবীর চীৎকারে, 'এনে দাও, এনে দাও, তোমরা আমার নিমাইকে এনে দাও।'

বাসু ঘোষ আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে ফেলছেন দীর্ঘশ্বাস। শুনছেন শচীদেবীর মর্মান্তিক আর্তনাদ—

পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচীদেবী বলে
লাগিল দারুণ বিধিবাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
সোনার পুতলি গোরাচাঁদে॥

ভক্তদের মনে কোনো দ্বিধা নেই। তাঁদের ধারণা—প্রভু চলে গেছেন। কিন্তু এখন উপায়? কি বলে তাঁরা শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিবেন? কেমন করেই বা ফিরিয়ে আনবেন প্রভুকে নবদ্বীপে। নদীয়া-জীবন গৌরসুন্দর বিহনে আজ ঘরে ঘরে নেমেছে বিষাদের ছায়া। ভক্তবৃন্দ আকুল। তাঁদের আহার নিদ্রা সব বন্ধ। কোন্ পথে অনুসন্ধান করলে তাঁর দেখা মিলবে? বললেন

নিত্যানন্দ, 'প্রভু বলেছিলেন, কাটোয়ায় কেশবভারতীর আশ্রমে যাবেন। সন্ন্যাস নেবেন তাঁর কাছে। চলো, আগে সেখানে যাই।

সেখানে যদি না পাওয়া যায়? তবে কি হবে?

তবে ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে যাবেন তাঁরা। কান্নার অশ্রুতে ভাসিয়ে দেবেন মনের তরণী। বৃন্দাবনে, নীলাচলে, পাণ্ডুপুরে, সর্বত্র চলবে অনুসন্ধান।

সম্মত হলেন সবাই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রস্তাবে। এলেন শচীমাতার কাছে। ভিক্ষা করলেন আশীর্বাদ। মাকে বললেন নিতাই, 'মা, তুমি কেঁদো না। আমি যেমন করে পারি, প্রভুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। তোমার ছেলেকে এনে দেব তোমারই কাছে। তোমারই কোলে।'

প্রণাম করলেন তাঁরা মায়ের শ্রীচরণে। যাত্রা করলেন কাটোয়ার পথে। যাবেন তাঁরা কাঞ্চন নগরে। যাবেন দণ্ডী কেশবভারতীর আশ্রমে।

> 'চন্দ্রশেখর আচার্য, পণ্ডিত দামোদর।
> বক্রেশ্বর আদি কবি চলিল সত্বর ॥
> এই সব লইয়া নিত্যানন্দ চলি যায়।
> প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ॥'

যাত্রা করলেন নিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ও দামোদর। বেদনার এবং বিরহের অশ্রুসাগর তীরে বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীবাস। একদিকে শচীমাতা। আর একদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া। এ যেন দুই কান্নার অথৈ উদধি। শুধু দীর্ঘশ্বাস। হতাশা ও হাহাকারে ভরা এ সংসার। শূন্য এ মন্দির। দেবতা নেই ঘরে। কেমন করে কাটবে তাঁদের দিন। অন্ধকারের সায়র শিয়রে এ যেন সর্বংসহা সরযূ। শচীমাতার মনে দিবস শর্বরী বিলাপের আর্তনাদ—

'আর না হেরিব প্রসব কপালে অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চেয়ে॥'

পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকেন জননী শচীদেবী। বৈরাগী, সাধু অথবা সন্ন্যাসী দেখলে যান এগিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের কোণে উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে থাকেন অপলক। আকুল আর্তির সুরে সুধান শচীদেবী, 'ওগো, তোমরা দেখেছ আমার নিমাইকে?...এক নবীন সন্ন্যাসী?'

কেউ হয়তো বললে—'হ্যাঁ, তাঁকে দেখেছি।'

—'কোথায়!'

—'দেখেছি তাঁকে কেশবভারতীর আশ্রমে কাঞ্চন নগরে। আহা! যেন সাক্ষাৎ জগন্নাথ।'

পথিক আবার পথ চলে। চলে যায় যে যার গন্তব্য স্থানে।

এ দিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের নিভৃতে গুমড়ে ওঠে কান্নার কাতরিমা—

'নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দরে না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেহ হেন জন, আনিবে তখন আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া বংশী গড়ি যায়॥'

ঘুম আসে না বিষ্ণুপ্রিয়ার। জেগে বসে থাকেন সারা রাত। তাকিয়ে থাকেন বাতায়নের পথে। পাতার শব্দ হলে চমকে ওঠেন। বন মর্মর শুনে ভাবেন—ঐ বুঝি প্রভু এলো।

শীতের রাত। নিথর চতুর্দিক। সহসা আঁতকে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া। জানলার কাছে ছুটে যান। তাকান বাইরের পানে। না, কিছু না। শিশির পড়ছে টপ টপ করে। হতাশ হয়ে শুয়ে পড়েন বিষ্ণুপ্রিয়া। কাউকে মুখ দেখান না। মরমে মরে, দুঃখকে দোসর করে দিন কাটান।

শুধু কি তাই? আহারও গিয়েছে বন্ধ হয়ে।

'যেদিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥'

অবশেষে শচীদেবীর একান্ত অনুরোধে তাঁর পাতের প্রসাদে করেন প্রিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি। দু এক গ্রাস মুখে দিলেই যায় পেট ভরে। কোনো রকমে পাখীর মত খুঁটে খেয়ে দিন কাটান। আর স্বাদ নেই জীবনে কিছু। তাই মায়াও নেই। দেহ বোধ তিরহিত প্রায়। কষ্টে ক্লিষ্টে চলেছেন আয়ুর ঋণ পরিশোধ করে।

ও দিকে কাঞ্চন নগরে ডেকেছে আনন্দের বান। তরুণ তাপসের হাতে তুলে দিয়েছেন কেশবভারতী অরুণ বরণ বহির্বাস। তুলে দিয়েছেন ডোর এবং কৌপীন। মন্ত্র রেখেছেন কানে। স্নেহভরে বলেছেন, 'তুমি জীব জীবনে এনেছে কৃষ্ণ চেতনা। তোমার সমস্ত চেতনায় বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই তো কৃষ্ণ! আজ থেকে তোমার নতুন নাম দিলেম—'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'।

জীবের দুঃখে মা ও পত্নীকে ছেড়ে এলেন। আজ ত্যাগ করলেন বসন, ভূষণ, আহার, নিদ্রা ও নিজের নামটি পর্যন্ত। এই বাঙালার প্রাণের ঠাকুর আঁখি ভরা জল ও বুক ভরা কান্না নিয়ে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের পথে। কণ্ঠে তার এক ধ্বনি—হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

—আর কতদূর! বৃন্দাবন কতদূর!

চেনা নেই। জানা নেই। বিদেশ বিভুঁই। শুধু ছুটছেন। অন্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে নিকুঞ্জের মর্মর। ভ্রমরের গুঞ্জন। কোকিলের কুহু কুহু। আর যমুনার বিরহ ভরা উজান উচ্ছ্বাস। পাগল হয়ে গিয়েছেন নিমাই-সুন্দর। প্রেমময়ের প্রেমমধুর বংশীধ্বনি যে তাঁর অন্তর ছিঁড়ে নিতে চাইছে। তাই তো শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের অভিসারে উন্মাদ।

ও দিকে পেছনে পেছনে আকুল আর্তি ভরা কণ্ঠে এগিয়ে

আসছেন ভক্তবৃন্দ। শুধু তাঁরাই নয়, সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য নর ও নারী। তারা যে তাদের প্রেমপুরুষটির জন্য অধীর। অবশেষে তারা এসে ধরে ফেললেন প্রভুকে। নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে কান্নার কাতরিমা। অঝোরে জল ঝরছে দু চোখে—'তোমরা বলতে পার বৃন্দাবন কত দূরে?'

নিতাই এগিয়ে গিয়ে ধরলেন। বৃন্দাবনের নাম করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন অদ্বৈতের ঘরে, শান্তিপুরে।

সু-সংবাদ। নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল। শচীদেবীও শুনলেন এ সমাচার। নিতাই গিয়ে হাজির হলেন দুঃখিনী জননীর কাছে। বললেন—'চলো মা প্রভুকে ফিরিয়ে এনেছি।'

দলে দলে নদীয়াবাসী ছুটলো শান্তিপুরের পথে। তারা দেখবে তাদের প্রিয় প্রভুকে। দেখবে নিমাইচন্দ্রোদয়।

শচীদেবীও প্রস্তুত। দোলা এসে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়াও আসছেন এগিয়ে। সঙ্গে রয়েছেন কাঞ্চনা। দোলার কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়ালেন দু জনে। শ্রীপাদের চোখ দুটি গিয়েছে স্থির হয়ে। বুকের মধ্যে এতক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে অবাধ্য নর্তন। কিন্তু কেন? প্রভু যে শুধু মাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। কে এই নিমর্ম শেল বিঁধে দেবে বিষ্ণুপ্রিয়ার বক্ষে? নিত্যানন্দ গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়ালেন প্রিয়াজীর সন্মুখে। আড়ষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শ্রীমতীর যাবার আদেশ নেই।'

সহসা চমকে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর সমস্ত দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত। এ কথা কিছুতেই তিনি ভাবতে পারেন না। এত নিষ্ঠুর, এত নির্দয় প্রভু!

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুটি চোখ বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। তাঁর অবস্থা দেখে উপস্থিত দর্শকবৃন্দও চোখ মুছতে লাগল বারে বারে। আর দাঁড়িয়ে থাকবার মত অবস্থা নেই। এত বড় আঘাত, এত বড় উপেক্ষা সইতে পারলেন না প্রিয়াজী। তিনি সখীর হাত ধরে

যেমন এসেছিলেন, তেমনি আবার চলে গেলেন। এমন নির্মম কঠোর প্রভু কেন হলেন? বুঝিবা আজন্মের মত তিনি ত্যাগ করছেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তাই ও মুখ আর দেখবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াও সংকল্পে দৃঢ়। তিনিও আর দেখাবেন না কাউকে তাঁর মুখ।

শচীদেবী এ দৃশ্য কিছুতেই সহজ ভাবে নিতে পারলেন না। প্রিয়ার বেদনাহত রোদন ভরা অন্তরের পানে তাকিয়ে, প্রিয় পুত্রের দর্শন-অভিলাষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে তিনি বিন্দু কুণ্ঠা করলেন না। শচীদেবী নিত্যানন্দকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন,—

'তুমি ফিরে যাও। যদি এ অভাগিনী না যেতে পারে, তবে আমিও যাবো না।'

শচীদেবীর কথা শুনে বেদনায় সবাই হাহাকার করে উঠল। তারা প্রভুকে কাতর কণ্ঠে ডাকতে লাগল। ডাকতে লাগল কেঁদে কেঁদে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্নায় শচীদেবী কাঁদলেন। শচীদেবীর কান্নায় জীব কাঁদল। এই তো সেই মহা লগন। সমাগত হয়েছে শুভদিন। বলেছিলেন প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে, 'তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না।'

আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনে জীব কাঁদছে। কাঁদছে প্রভুকে স্মরণ করে। জীব চিত্তের মালিন্য ধুয়ে যাচ্ছে। তারা আজ প্রিয়ার ব্যথায় ব্যথী। প্রিয়াজীর প্রিয় পুরুষটির জন্য তারাও কাঁদছে। কে সেই পুরুষ? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কান্না দিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তুষ্ট করতে হয় তাঁকে চোখের জলে চরণ সিঞ্চন করে। প্রিয়াজী কেঁদে কেঁদে সবাইকে দিলেন কান্নার মন্ত্র। ভগবানের জন্য কাঁদতে পারা কি কম ভাগ্যের কথা!

মাতৃ মন একদিকে প্রিয় পুত্রের দর্শন আকুতিতে আকুল, আর

এক দিকে বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনায় অভিমানের বিরতি। বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ের পানে তাকিয়ে অবশেষে বললেন,—'তুমি যাও। তুমি না গেলে তিনি যে দুঃখ পাবেন। আমার জন্য তুমি কেন হবে তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিতা? আমার জন্য ব্যথা পেও না মা। আমি কি তাঁর ধর্ম পথের অন্তরায় হতে পারি? তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর তৃপ্তি সাধন করাই তো আমার কর্তব্য ও সাধনা মা!'

হে প্রভু, তোমার সুখ, তোমার তৃপ্তি, তোমার শান্তি বিধান করতে আমি রইলেম বক্ষে বজ্র বেঁধে। তুমি তোমার অভিষ্ট পথে সিদ্ধ হও। জীবকে কর নামমুখী। তাদের কৃষ্ণপ্রেম দানে ধন্য কর। মুক্ত কর। এই শুধু চির বিরহিনীর শেষ ভিক্ষা।

শচীদেবী যাত্রা করলেন নিত্যানন্দের সঙ্গে। শূন্য ঘরের আঁধার আবর্তে ফিরে এলেন দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। বুকে তাঁর শেল বিদ্ধ। চোখে তাঁর অশেষ অশ্রু! অবশেষে হাহাকার করে উঠলেন আর টিকতে না পেরে—

'এ ঘর জননী ছাড়ি মুঞি অনাথিনী করি
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।'

তুমি যুগে যুগে বারে বারে এসেছ। এসেছ বিরহের লীলা খেলা খেলতে। কিন্তু কই? আমার মত আর কাউকে তুমি তো কখনো কাঁদাও নি! বল, কত কাঁদলে, কত চোখের জল ঝরলে মিলবে তোমার সুখ মধুর দর্শন! আমি যে আর থাকতে পারিনে? ও চরণ বৈ আর যে কিছু নেই আমার আরাধনার।

এতক্ষণে শচীদেবী পৌঁছে গিয়েছেন প্রভুর কাছে। বাৎসল্যের পরম তৃপ্তিতে ছেলেকে টেনে নিয়েছেন অঙ্কে। জড়িয়ে ধরেছেন বুকের মধ্যে। বারে বারে তাঁকাচ্ছেন ছেলের মুখের পানে। কই, কই সে চাঁচর কেশ? নিমাইয়ের পরনে বসন নেই। এ যে কৌপীনধারী সন্ন্যাসী!

মায়ের পানে তাকিয়ে নিমাই যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কত দুঃখ, কত কষ্ট করেছেন মা এই সন্তানকে বুকে ধরে। আজ সেই মাকে ছেড়ে নিমাই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছে। অনেক কথা, অনেক স্মৃতি এসে নিমাইকে যেন কেমন চঞ্চল করে দিল। মায়ের জন্য আকুল হয়ে উঠল প্রাণ। তাই তো হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি, 'মা যা বলবেন, আমি তাই করব। যদি তিনি আমাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিতে চান, তাই যাব। আবার সংসার বাঁধব। তবুও মাকে আমার দুঃখ দিতে পারব না।'

ভক্তবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। কারণ শচীদেবী নিশ্চয়ই আর যেতে দেবেন না তাঁর সন্তানকে। প্রভুকে আবার তাঁরা পাবেন তাঁদেরই মধ্যে। মা যা বলবেন প্রভু তাই করবেন।

সকলের চোখ শচীমাতার দিকে। ক্ষণকাল নীরব রইলেন জননী শচীদেবী। তারপরে বললেন, 'না, তা হয়না। নিমাইকে আমি নিন্দার পাত্র করতে পারি না মানুষের কাছে। জীব কল্যাণে যখন সে সন্ন্যাস নিয়েছে, তখন ঐ-ই তার পথ। তাছাড়া নিমাইয়ের ইচ্ছাও তাই।'

ভক্তগণ হাহাকার করে উঠল। মায়ের মুখ থেকে এ কি কথা: কোন মা চান তাঁর সন্তানকে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতে দিতে?

মায়া, মায়া। সবই প্রভুর লীলা খেলা। শচীদেবী তখনকার মত দেখলেন তাঁর নিমাই শুধু তাঁরই নয়। জগতের জীব এই নিমাইয়ের পানেই তাঁকিয়ে আছে আকুল হয়ে। নিমাই সকলের। নিমাই বিশ্বমনের আরাধনার ধন। তাই তো শচীদেবী আদেশ দিলেন সানন্দে।

নিমাই বললেন, 'মাতৃ আজ্ঞাই শিরোধার্য। দু'তিন দিন পরেই আমি যাত্রা করব নীলাচলে।'

দেখতে না দেখতেই তিনটি দিন হয়ে গেল অতিবাহিত।

নিমাই এসে দাঁড়ালেন মায়ের কাছে। বললেন, 'অনুমতি দাও মা। আমি নীলাচলে যাই।'

স্নেহাতুর মন হাহাকার করে উঠল। তবুও শচীদেবী বললেন, 'যাও বাবা, নীলাচলে গিয়ে তুমি থাকো। কিন্তু ভুলনা তোমার এই দুঃখিনী জননীকে।'

কেঁদে ফেললেন শচীদেবী।

নিমাই বললেন, 'তুমি যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তখনই এসে তোমার সামনে দাঁড়াব।'

এই তাঁর শেষ কথা। পাঁচজন ভক্ত চললেন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলের পথে।

শচীদেবী এতক্ষণ ছিলেন অন্য জগতে। কিন্তু নিমাই চলে যেতেই ফিরে এল তার সম্বিৎ। কেটে গেল আবেশ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে। হাহাকার করে উঠলেন বক্ষদীর্ণ আর্তনাদে, 'হায়, হায়, এ আমি কি করলেম!'

॥ একুশ ॥

অতীতকে জীবন থেকে বাদ দিতে চাইলেই কি বাদ দেওয়া যায় ?

না।

সে বড় নিষ্ঠুর! বড় নির্মম। বারে বারে ফিরে ফিরে আসে। আসে দহনের দুঃস্পর্শ নিয়ে। আসে কান্নার কৃষ্ণতা নিয়ে।

পর পর আঠারোটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। জীবনের শুরু থেকেই দুঃখ, কান্না ও হাহাকারে প্রিয়ার প্রাণ স্পন্দিত। দিনের দরজায় কতবার এসে হান দিয়েছে দুঃখের যামিনী। যাতনায় অস্থির হয়ে গিয়েছেন প্রিয়াজী। ঝড়ের পরে ঝড়, বারে বারে বিধ্বস্ত করে গেল। রেখে গেল জীবন যন্ত্রণার দুঃসহ পীড়ন। বুঝিবা এই কান্না দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে জীবনের।

আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গিনী শুধুই স্মৃতি। এক একটা কথা মনে পড়ে। অমনি প্রিয়াজী স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক স্থাণুর মত বসে ভাবেন। প্রভু যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন,—

'কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি।' চৈঃ মঃ

আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বল বলতে শুধু এই তো। কি আছে আর ? কিছু না। ভজন, পূজন, কীর্তন আর মনন। আর আছেন তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ী। তাঁর মুখের দুয়ার আর বন্ধ হয় না। দিন রাত বলেন তিনি গৌর-কথন। আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণকে ভজনা করতে করতে কখন যেন পৌঁছে যান গৌর-ভজনে। অনিবার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় —নিমাই-নিমাই-নিমাই। এই তো তাঁর জপমালার

ইষ্ট মন্ত্র। এই তো তাঁর বীজ। 'নিমাই' জপতে জপতে অবশ হয়ে আসে তনু। হারিয়ে ফেলেন বাহ্যজ্ঞান। নিমাই এসে দাঁড়ান তাঁর চোখের সামনে। আলোয় আলোময় হয়ে যায় সব কিছু। রাত্রির জঠরে চলে জীবন-বন্ধুর সঙ্গে প্রাণের কথোপকথন—হে করুণাঘন, হে কৃষ্ণ, হে আমার নিমাই, আমাকে দেখা দাও। খেয়ে যাও এসে অভাগীর নিবেদিত অন্ন।

এমনি করে দিন যায়। রাত আসে। আবার রাত ভোর হয়। পাখী ডাকে। কোনো ব্যতিক্রম নেই প্রকৃতির চলার ছন্দে। শচীদেবীর এখন নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হল বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরে গঙ্গায় যাওয়া। সঙ্গে থাকেন সেই চির পুরাতন সেবক দুঃখী ঈশান। স্নান সেরে ফেরেন বাড়িতে। করেন পুষ্প চয়ন। বসেন দেবমন্দিরে। নিবেদন করেন কান্নার মন্ত্র। ডাকেন তাঁর নিমাইকে। কখনো বা পাগলিনীর মত প্রলাপ বকেন। কি বলতে কি বলেন থাকে না খেয়াল।

বলি বিষ্ণুপ্রিয়ার কি জ্বালা কম কিছু? দহন-মরু অন্তর। কিন্তু বাইরে নির্মল স্নিগ্ধতা। কারণ সব কিছুকেই নীরবে হজম করে নিতে হচ্ছে তাঁকে আজকাল। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ কালো দেখলেই, শচীমাতা কেমন যেন হয়ে পড়েন। তাঁকে সামাল দেওয়া হয়ে ওঠে দায়। তাই বিষ্ণুপ্রিয়া সব দুঃখকে ঢেকে রাখেন সন্তোষের প্রলেপে। কেবল মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন তিনি, সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষটির কাছে, 'ওগো, তুমি কি আমার জন্যই ঘর হারা, দেশ ছাড়া হয়েছে?'

'যদি সত্যি তাই হয়ে থাকো, তবে আমিই বা কেন হবনা যোগিণী? কেন ধারণ করব না সন্ন্যাসিনীর বেশ?'

শুয়েছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। উঠে বসলেন। তাকালেন এ দিক ও দিক। কেউ নেই। শচীদেবীও গিয়েছেন মন্দিরে। এই তো প্রকৃষ্ট সময়।

একাকিনী বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি খুলতে লাগলেন তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার। পট্টবাসের পরিবর্তে পরিধান করলেন গৈরিক বসন। গৈরিক আঁচলে আচ্ছাদিত করলেন অবাধ্য যৌবনকে। মুছে ফেললেন কান্নার অশ্রু। রসবল্লভা এবারে যোগিনী। কৃচ্ছব্রতের তপশ্চর্যায় মৌন। নিথর। বিষ্ণুপ্রিয়া কি যে সে! এ যে গৌরাঙ্গের ষড়বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী। সর্বশক্তির মূল আধার। গরীয়সী গৌরাঙ্গী। প্রিয়া পিছু টানলে গৌরের কি সাধ্য সম্মুখে যান?

ধ্যানমগ্না বিষ্ণুপ্রিয়া। তলিয়ে গেছেন অথৈ অতলে। নিমজ্জিত হয়েছেন তাঁর প্রিয় প্রভুর তনুভায়। প্রথম জ্যোতি দর্শন। তার পরে রূপের বিভা। ধীরে ধীরে আভাসিত হলেন প্রভু।

প্রিয়াজী মন্ময়। তন্ময়। আনন্দের প্রাণলোকে প্রভাময়ী।

ঠিক এমনি মুহূর্তে এসে হাজির হলেন সখী কাঞ্চনা। বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে গেলেন অবাক হয়ে। ছুটে গেলেন শচীদেবীর কাছে। বললেন তাঁকে কম্প্র কণ্ঠে, 'মা, একবারটি এসো। দেখে যাও তোমার পুত্র বধুকে। ধ্যানাসনে সমাসীন প্রিয়া। নিথর, নিস্তব্ধ। খুলে ফেলেছে অঙ্গের অলঙ্কার। পরেছে গৈরিক। সমস্ত অঙ্গে মেখেছে ভস্ম। আমি তাকাতে পারিনি। ওকে যেন পাগলিনীর মত দেখাচ্ছে।'

কাঞ্চনা কেঁদে ফেললেন। সঙ্গে শচীদেবীও। ছুটে এলেন ত্রস্তা হরিণীর মত, টেনে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোলের মধ্যে। বলতে লাগলেন, 'মা, তুমি তো মা। জগতের মা। জীবের মা। মায়ের চোখে জল দেখে সন্তান কাঁদবে। তোমার স্বামী যে জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের কানে দিয়ে গেছেন কান্নার মন্ত্র। তুমি প্রাণভরে কাঁদো। আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদি। ওগো, রোদন আমাদের ভজন। এ ভজন তুমি কেন ছাড়লে মা?'

কঠোর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে টেনে আনলেন শচীদেবী কোমলে। এ ভাবে থাকলে যে বিষ্ণুপ্রিয়া পাগল হয়ে যাবে। তাই তো শচীদেবীর এ প্রচেষ্টা।

প্রিয়া মায়ের স্নেহ-স্পর্শে পড়লেন মূর্ছিতা হয়ে। জ্ঞান হারিয়ে গেল তার। শচীদেবী চীৎকার করে উঠলেন—একি হল?

ছুটে এলেন কাঞ্চনা। বিরহিনী বুঝি বিরহ-সন্তাপে দেহ ছেড়ে যাচ্ছে। আহা এ কি হল গো! প্রিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে নাম করতে লাগলেন কাঞ্চনা। গৌরবিরহ ব্যাধির এ যে মহৌষধ। যে নামে অজ্ঞান, সেই নামেই আবার জাগরণ। এ যেন ঠিক ব্রজ বিরহিনী শ্রীরাধিকা। কাঞ্চনা ফিরিয়ে আনলেন তাঁর জ্ঞান।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না আর থামে না। কাঞ্চনা সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রিয়াকে, 'কাঁদিসনে সই। তোর প্রাণবল্লভ আসবেন। শীগগিরই ফিরে আসবেন। জননী এবং জন্মভুমিকে দর্শন করতে তাঁকে আসতেই হবে।'

প্রিয়ার মরু-মর্মে এ যেন এক আজল চেরাপুঞ্জির করুণা। হত চকিত হয়ে উঠলেন তিনি। শুধালেন বিস্ময় ভরা কণ্ঠে,—'সত্যি বলছিস? তিনি আসবেন?'

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ভেঙ্গে পড়লেন, 'তিনি যে আমার জন্যই হয়েছেন গৃহত্যাগী! এ পাপিনী জীবিত থাকতে তিনি কি ফিরে আসবেন নদীয়ায়?'

আবার বললেন, 'এমন দিন কবে হবে রে কাঞ্চনা?'

কাঞ্চনা বললেন, 'দামোদর পণ্ডিত খবর এনেছেন। প্রভু কয়েক দিনের মধ্যেই নদীয়ায় আসছেন।'

দামোদর পণ্ডিত সংবাদ নিয়ে এসেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে প্রভু ফিরে আসছেন নবদ্বীপে।

সবাই দিন গুনছে। দিন গুনছে নবদ্বীপের জন-জীবন।

শুধু কি এই একটি সংবাদই নিয়ে এসেছেন দামোদর পণ্ডিত ?

না।

তবে ?

নীলাচল থেকে তিনি প্রভুকে দর্শন করে প্রত্যাবর্তন করেছেন নদীয়ায়। প্রিয়ার জন্য দামোদরের হাতে প্রভু পাঠিয়ে দিয়েছেন পট্টবাস। আর মায়ের জন্য পাঠিয়েছেন জগন্নাথের প্রসাদ। শচীদেবীর খুশী আর ধরে না। এতদিন পরে নিমাই তাঁকে মনে করেছে। এ কি কম আনন্দের কথা! আত্মহারা শচীদেবী উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, 'ওরে ও বিষ্ণুপ্রিয়া, কোথায় গেলি ? এই ছ্যাখ, নিমাই আমার কত কি পাঠিয়েছে। নে, ধর, এখনই ও দুঃখিনী বেশ ছেড়ে শাড়ী পড়ে আয় গে, যা !'

হাত পাতলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শাড়ীখানা নিলেন। চলে গেলেন একটু আড়ালে শাড়ীখানা চেপে ধরলেন বুকে। দু চোখে এলো আবেগাশ্রু। বারে বারে তা বক্ষ মাঝে ধারণ করে উপলব্ধি করতে লাগলেন প্রভুর স্পর্শ। তার পরে চলে এলেন অন্দরে। বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ আনন্দের সীমা নেই। দূরে বহু দূরে গিয়েও প্রভু বিস্মৃত হন নি তাঁর প্রিয়াকে। সম্পূর্ণ ভাবেই মনে রেখেছেন তাঁকে। তাই তো পাঠিয়ে দিয়েছেন শাড়ী। এ লীলা অপূর্ব। এ ধারা অন্তহীন। এখানেই পরিলক্ষিত হয় নবদ্বীপ লীলার স্বাতন্ত্র্য। গৌরলীলার স্বকীয়তা।

এ দিকে শচীদেবীর আনন্দের অন্ত নেই। তিনি এক রকম আত্মাহারা হয়ে গিয়েছেন ছেলের আগমন সংবাদে। দুঃখের কটাহে আনন্দের বার্তাটি তাঁর আপন সত্বাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তিনি বসে থাকেন পথের ধারে। যাকে দেখেন তার কাছেই শুধান,—কতদূর এল নিমাই ? তোমরা তাকে কেউ দেখেছ কি ?

কখনও বা নিজের খেয়ালে কথা বলেন তিনি। রাতে

একটুও ঘুমান না। এক রকম জেগেই বসে থাকেন। কখন বা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডেকে বলেন, 'বউমা, নিমাইকে একবার এ ঘরে পাঠিয়ে দাও তো।'

বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন শাশুড়ীর মুখের পানে। কোথায় তাঁর নিমাই! তিনি তো এখনও আসেন নি।

ক্ষণ বিরতি। পরেই আবার সম্বিৎ ফিরে পান শচীদেবী। বলেন, 'বৃদ্ধা হয়েছি মা। কি বলতে যে কি বলে ফেলি, খেয়াল থাকে না।'

রোজই রান্না করেন শচীমাতা ছেলের জন্য। নিবেদন করেন নিমাইয়ের উদ্দেশ্যে। নিত্যকর্ম সমাধা করে শুয়ে পড়েন শয্যায়। নেমে আসে একটু তন্দ্রা। অমনি শুরু হয় স্বপ্ন দর্শন। মায়ের নিবেদিত অন্ন এসে খেয়ে যান নিমাই। মায়ের মনের বেদনা করেন দূর। হোক স্বপ্ন, তবুও শচীদেবীর তৃপ্তির অন্ত নেই।

আবার শচীদেবী দেখেন তাঁর নিমাই রয়েছে শ্রীবাসের বাড়িতে। ভাত রান্না করে বসে আছেন শচীদেবী। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাই ছুটতে ছুটতে গেলেন শ্রীবাসের বাড়িতে। গিয়ে ডাকছেন, 'ওরে সই মালিনী, আমি যে কখন রেঁধে বসে আছি। ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তোদের বাড়িতে নিমাই এসেছে?'

মালিনী তাকিয়ে থাকেন বিমূঢ় বিস্ময়ে। ধীরে ধীরে শচীদেবীর আবেশ যায় কেটে। হাহাকারে ভরে ওঠে অন্তর।

এমনি করে দিনের পর দিন কাটে। অশ্রুতে, আবেগে, আর্তিতে, বেদনায় শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার দিবস শর্বরী হয় অতিবাহিত। অবশেষে দিন ঘুরল। বিধি হলেন সুপ্রসন্ন।

সেদিন সকাল থেকেই শচীদেবীর মনটা বেশ ভাল লাগছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াও শাশুড়ীর হাবভাব দেখে হয়েছেন একটু সতেজ। কেমন যেন একটা পরিবর্তিত আবেশ। আকাশ, বাতাস, জল, জঙ্গল সবই যেন প্রাণবন্ত সজীব। পাখীরাও গান গাইছে আজ

নতুন সুরে। নতুন কণ্ঠে। অসীম যেন এসে একাত্ম হয়ে উঠেছে প্রিয়া এবং শচীদেবীর সসীম পৃথিবীতে। নিত্য ধামের সংবাদ ভেসে আসছে। ওঁরা উৎকর্ণ। উৎকণ্ঠায় অধীর।

সহসা মুখর হয়ে উঠল আকাশ মাটি। হাজার হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে ঘোষিত হল গৌরসুন্দরের আগমন বার্তা। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে। বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবী আকুল উৎকণ্ঠায় ছুটে এলেন বাতায়নের পথে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন প্রতীক্ষিত মন নিয়ে। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন শচীদেবী। ছুটে বেরিয়ে এলেন পথে। সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকেও নিয়ে এলেন। ঈশান পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন। লোকের অবিচ্ছিন্ন মিছিল। তারা চলেছে তাদের প্রাণের জনকে বরণ করতে।

শচীদেবীর অনেক ভাবনা। তিনি ভাবছেন—নিমাই হয়ত জন্মভূমি দর্শন করেই বিদায় নেবে। সন্ন্যাসীর তো স্ত্রীর মুখ দর্শন করতে নেই। তা হোক। তা বলে বিষ্ণুপ্রিয়া হবে কেন প্রভুর চরণ দর্শনে বঞ্চিতা ?

বয়ে চলেছে কুলু কুলু নাদে গঙ্গা। এপার আর ওপার। দূরত্ব আর কত টুকু ? ওপারে এসে পৌঁছে গেছেন প্রভু। দাঁড়িয়েছেন কনক কান্তি নিয়ে। এপারে দাঁড়িয়ে শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়া। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা মা। হাত পায় একটুও জোর নেই। কাঁপছেন থরথর করে। মনটা করছে দুরু দুরু। এত দূর এসে পাব না কি নিমাইয়ের দেখা ?

সহসা লাখো লাখো লোকের কল-কল্লোলে ঘোষিত হল—ঐ-ঐ যে—প্রভু !

বিষ্ণুপ্রিয়ার দৃষ্টি বিসারিত হয়ে গেল ওপারে। অগুণতি লোক। তার মধ্য থেকে প্রস্ফুটিত হল ভোরের কমল বদন। ঠিক দেখে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দেখে নিলেন তার প্রাণপ্রভুর মুখ মণ্ডল।

কিন্তু কৈ, কৈ গো সেই চাচর কেশ। কোথায় সেই বিনোদ কান্তি! এ যে অন্য রূপ। অন্য বেশ। প্রিয়ার বুক ঠেলে কান্না এল।

প্রভুকে নিয়ে এতক্ষণে ভক্তবৃন্দ এগিয়ে চললেন। বাড়িতে ফিরে এলেন শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। চারিদিকে আনন্দ। কিন্তু শচীদেবীর মুখে বিষাদের ছায়া। কৈ, এখনো এল না তো সে! আবার সেই পূর্বের ভাব ধারণ করলেন শচীদেবী, 'ওরে নিমাই, তুই একবারটি দেখা দিয়ে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দে!'

শচীদেবীর কান্নায় প্রিয়ার মনে এল চাঞ্চল্য। নানা প্রশ্নের ঝড় উঠল। ভেঙ্গে পড়লেন 'বষ্ণুপ্রিয়া। কাঞ্চনার পানে তাকিয়ে বললেন প্রিয়া, 'সইরে, প্রভু বুঝি আমার জন্যেই আসছেন না মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বল, এ জীবন রেখে কি লাভ রে কাঞ্চনা? এর চেয়ে আমার মরণ ভাল।'

কাঞ্চনা বলেন, 'কি বাজে চিন্তা করছিস। তোর ভাবনা অলীক। ও কি অলক্ষুণে কথা!'

ওদিকে ঘর থেকে ছুটে এলেন শচীদেবী। নামলেন পথে। চললেন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে। ওখানে প্রভু এসেছেন। ওখানে গেলে নিশ্চয় দেখা হবে নিমাইয়ের সঙ্গে। ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ছুটে চলেছেন শচীদেবী। যাকে দেখছেন তাকেই জিজ্ঞেস করছেন, 'এই শোন, নদীয়ায় নিমাই চাঁদ এসেছে। তোমরা তাকে ধরে রেখো। আর যেতে দিও না।'

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং কাঞ্চনা বসে আছেন মুখোমুখি। সখীর কাছে সখী বলছেন তাঁর মনের কথা। দুঃখের কথা। কান্নার কথা। এ কান্না তো বিশ্বমনের। বিশ্ব-চিত্তের।

সহসা বিষ্ণুপ্রিয়া কি ভেবে যেন বলে উঠলেন, 'না গো না, আমি মরব না সখী! মরে গেলে শুনতে পাব না প্রাণবল্লভের গুণগাথা, লীলা কথা।'

ও দিকে শচীদেবী এতক্ষণে ঝড়ের মত এসে ঢুকলেন শুক্লাম্বরের

বাড়িতে। পাগলিনী এসে দাঁড়ালেন নিমাইয়ের মুখোমুখী। নিমাই প্রণাম করলেন মাকে। রুদ্ধ দুয়ার ভেঙ্গে গেল। ফেটে পড়লেন শচীদেবী, 'আর সন্ন্যাসে কাজ নেই রে নিমাই! চল, ঘরে ফিরে চল!'

প্রভু বললেন, 'মা, আমি তোমার অনুমতি ছাড়া কিছু করিনি তো! কেন কাঁদছ! আমাকে পুত্র বলে এখনও মিছে মায়া কেন মা?'

শচীদেবী চিৎকার করে উঠলেন, 'না-না-না। ও কথা বলিসনে তুই! আমি যেন তোকে জন্মে জন্মে পুত্ররূপে পাই। বাপরে, এ মায়াপাশ কাটাতে তুই আমাকে দিসনে। তোর মায়াই আমার সাধনারে নিমু। তোর মায়াই আমার সাধনা।'

অপলক তাকিয়ে রইলেন মায়ের পানে নিমাই। অবশেষে বললেন, 'জন্মস্থান দর্শন না করে আমি যাব না মা। কাল সকালে তোমার গৃহদ্বারে আবাব আমাকে দেখতে পাবে।'

যাবার সময় মা বলে গেলেন, তাঁর স্নেহেব নিমাইয়ের পানে তাকিয়ে, 'আমি সারারাত দুয়ার খুলে বসে থাকব বাপ। তুই যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাস নে।'

শচীদেবী এসে সব কথা বললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। যেন মধু বর্ষণ হল। খুশী খুশী মুখখানা বিষ্ণুপ্রিয়ার। কাঞ্চনা বলে উঠলেন, 'আমি বলিনি সখী, তোকে না দেখে তোর প্রাণবল্লভ যেতে পারেন না।'

চাপা এক টুকরো হাসি চুমু দিয়ে গেল অধরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো প্রশ্নের শরবর্ষণ হল বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বিধান্বিত বক্ষে—সন্ন্যাসী কি স্ত্রীর মুখ দেখে কখনো। শাস্ত্রে তো এ নির্দেশ নেই! তবে কি প্রভু এ নির্দেশ মানবেন না?

সারাটা রাতে আর কেউই ঘুমাতে পারলেন না। না শচীদেবী না বিষ্ণুপ্রিয়া।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল কীর্তন কণ্ঠ। প্রভুকে নিয়ে এগিয়ে আসছেন ভক্তবৃন্দ। এগিয়ে আসছেন প্রভুরই গৃহাভিমুখে। জন্মস্থান দর্শন করতে আসছেন নবীন সন্ন্যাসী। এই তো শেষ

দেখা। আর কোনো দিন গৌরগুণমনি আসবেন না নবদ্বীপে। পথের দু ধারে কাতারে কাতারে লোক প্রভুজী এগিয়ে আসছেন। এগিয়ে আসছেন তাঁর বহু পরিচিত পথের ধুলি মাটিতে চরণ চিহ্ন একে একে। সহসা থমকে দাঁড়ালেন প্রভু দরজার কাছে। কেন?

দ্বারের অন্তরাল থেকে একটি দেহ লুটিয়ে পড়ল প্রভুর চরণ-প্রান্তে। পরনে মলিন একখানা বসন। কটা কটা রুক্ষ কেশ। আভরণ শূন্য। মুখে মাখা কালির আলিম্পন। কম্পিত দেহ। আঁখি ভরা জল। এ তো জল নয় প্রাণের প্রসূন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই নিবেদন করছেন তাঁর প্রিয় প্রভুর চরণে।

প্রভু বলে উঠলেন মধুর কণ্ঠে, 'কে, কে তুমি কল্যাণী?'

বিস্ময়ে নির্বাক ভক্তবৃন্দ। তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন নি, এমন কাজ বিষ্ণুপ্রিয়া করতে পারেন।

ধীরে অতি ধীরে মাথা তুলে তাকালেন প্রিয়া। তুলে ধরলেন শত শতাব্দীর একখানা অলিখিত অধ্যায়ের বেদন করুণ পরিচ্ছেদ। নগ্ন রাত্রির বিষন্নতা এসে প্রিয়াজীর মুখে মেখে দিল বেদনার আলিম্পন। আড়ষ্ট করুণ কণ্ঠে তিনি শুধু বললেন, 'তোমার দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া।'

একটি পা ও তুলতে পাড়লেন না প্রভু। দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণ-কাল নির্বাক স্থানুর মত। তারপরে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কি প্রার্থনা তোমার?

বিষ্ণুপ্রিয়া কান্না করুণ কণ্ঠে বললেন, 'জগৎ-জীব উদ্ধার হয়ে গেল ও দুটি রাঙ্গা পায়ের ছোঁয়া পেয়ে। কেবল কি বিষ্ণুপ্রিয়াই থাকবে চির বঞ্চিতা?'

প্রভু আর কি বলবেন? তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বিষ্ণুপ্রিয়া, এবারে তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও। তোমার নাম সার্থক কর।'

বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, 'তুমি ছাড়া তো আমার দ্বিতীয় কৃষ্ণ নেই প্রভু। আমার কৃষ্ণ, বিষ্ণু সবই যে তুমি।'

প্রভু বললেন, 'হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী। তোমাকে দেবার মতো আমার তো আর কিছু নেই!'

কিন্তু কিছু একটা দেবার জন্য গৌরসুন্দর ব্যাকুল। অবশেষে বললেন, 'আমার এই খড়ম নিয়ে গিয়ে তুমি পুজো কর। মনে শান্তি পাবে।'

একান্ত আগ্রহ ভরে বিষ্ণুপ্রিয়া মাথায় তুলে নিলেন মহাপ্রভুর পাদুকা। প্রণাম করলেন প্রভুর চরণারবিন্দে। দুইগণ্ড বেয়ে অঝোর ধারায় নামল অশ্রু উজান। ভক্তবৃন্দ আনন্দে বলে উঠলেন, 'জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া'। প্রিয়া তাঁর পরম সম্বল ও সারা জীবনের সঙ্গী ঐ খড়ম নিয়ে চলে গেলেন অন্দরে। বারে বারে তাতে মাথা ঠুকতে লাগলেন! আর দিতে লাগলেন অজস্র চুম্বন।

নবদ্বীপের আকাশ থেকে চির দিনের মত অস্তমিত হলেন গোরাচাঁদ।

॥ বাইশ ॥

শরীর ভেঙ্গেছে শচীদেবীর।

নিরাশা আর হতাশায় ভরা একটি মানুষ।

পথ চলতে কষ্ট হয়। কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আর কার জন্য বুক বেঁধে বসে থাকবেন? তাই তো মুক্তি চাইছেন এ পৃথিবী থেকে। সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার থেকে যেতে চাইছেন নীহারিকার ঊর্দ্ধলোকে। এবারে জ্যোতিষ্কের পথে হবে যাত্রার সূচনা। হবে সান্ত থেকে অনন্তের অভিসার।

এত বিলাপ, এত বৈরাগ্যের অন্তরাল রহস্যটি কি?

নিমাই নেই।

মাথার ঠিক নেই শচীদেবীর। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে ডাকেন আর্তকণ্ঠে—নিমাই! নিমাই! নিমাই! কখনো বা বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে বলেন, 'কই গো বউ, নিমাই তো এখনো এল না!'

রাত্রির জঠরে স্বপ্নের ঘোরে কেঁদে ওঠেন নিমাই, নিমাই বলে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার চিন্তার অন্ত নেই। শাশুড়ীর অবস্থা তাঁকে আরো দুর্বল করে দিয়েছে। কি বলে সান্ত্বনা দেবেন তাঁকে? কোন ভাষায়? কোন মন্ত্রে? দিন কাটে। মাস যায়। বছর ঘুরে আসে। বিষ্ণুপ্রিয়া বিলাপে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। লোচনদাস ধরে রাখেন প্রিয়ার প্রাণহরণ আর্তি কাব্যের ছন্দে। গৌর-প্রিয়া অধ্যায়ে একেই বলে শ্রীমতীর বার মাসিয়া—

১। ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ চাঁদে পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়াস আর ধূপ দীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥

ও গৌরাঙ্গ পহুঁ। তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বলে বৃদ্ধ যুবা ॥

২। চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ-কান্দে কি কহিব কাকে ॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু ॥
পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাব কার কোলে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥

৩। বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য-ধৌতি কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! বিষম বৈশাখের রৌদ্রঃ
তোমাকে না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥

৪। জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা ॥
সোঙরি সোঙরিপ্রাণ কান্দে নিশিদিন।
ছটফট করে যেন জল বিণু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

৫। আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাহুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
শুনিয়া মেঘের নাদ, ময়ুরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥

ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! মোরে সঙ্গে লইয়া যাও
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥

৬। শ্রাবনে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু, কারে কব কথা ॥
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি কিছু কর অবধান ॥

৭। ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী নাদে নীদ্রা মদন জাগায় ॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল ব্রজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! ভাদ্রের বিষম খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার জীবন্তে সে মরা ॥

৮। আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে ॥
শরৎ সময়ে যার নাম নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরনে মোর করিহ উদ্দেশ ॥

৯। কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা ॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী
এবে অভাগিণী মুই হেন পাপ রাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ ! তুমি অন্তর যামিনী।
তোমার চরণে আমি বলিতে জানি ॥

১০।　　অঘ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে, প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনে ত ভোটে, প্রভু, শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ!　তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

১১।　　পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ!　পরবাস নাহি পোহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম নহে॥

১২।　　মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিত।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই তো দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ!　মোরে লহ নিজ পাশ।
বিরহ—সাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥

আজ কাল আর উত্থান শক্তি নেই শচীদেবীর। তাঁকে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। এই তো তার দুঃখের সঙ্গিনী। শেষ সম্বল। যদি চলে যান? আর ভাবতে পারেন না বিষ্ণুপ্রিয়া। থর থর করে দেহ কাঁপতে থাকে। বুকের মধ্যে সুরু হয়ে যায় সুরধুনীর নর্তন।

নদীয়ার লোকেরা দলে দলে আসেন শচীদেবীকে দেখতে। বিষ্ণুপ্রিয়া অতন্দ্র প্রহরী যেন। সর্বদা শাশুড়ীর শিয়রে বসে থাকেন। করেন সেবা যত্ন।

প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান ওঁদের চির সঙ্গী। প্রাণ ঢেলে তিনি সেবা করছেন গৌর-সাক্ষীর। কিন্তু তাঁব দেহও ভেঙ্গেছে। তা বলে ঈশান ছুটি নেন নি। যত দিন প্রাণ আছে, ততদিন পালন করে যাবেন তাঁব কর্তব্য। সঙ্গে এসে আবার যোগ দান করলেন বংশীবদন। সবার দৃষ্টিই এখন শচীদেবীর 'পর। কারণ আর আশা নেই জীবনের। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবতে পারেন না তাঁর কি হবে। কি করে একাকী দিন যাপন করবেন তিনি। তাই থেকে থেকে শুধু কাঁদেন, আর ফেলেন দীর্ঘশ্বাস।

কাঞ্চনাকে ছাড়তে চান না বিষ্ণুপ্রিয়া। সদা সর্বদা তিনি থাকেন প্রিয়ার কাছে কাছে। কখন ভোর হয়, কখন যে সন্ধ্যা নামে, কিছু খেয়াল থাকে না প্রিয়ার। কোন দিন বা দুমুঠা অন্ন মুখে দেন। আবার কোন কোন দিন তাও আর হয়ে ওঠে না।

কাল একটুও ঘুমাতে পারেননি বিষ্ণুপ্রিয়া। খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে শচীদেবীর অবস্থা। একেবারে ঠায় বসে ছিলেন তাঁর শিয়রে। আশা বলতে আর নেই কিছুই। চতুর্দিক শূন্য। শেষ আলোটিও বুঝি এবারে নিভে যাবে। অপলক তাকিয়ে শাশুড়ীর মুখের পানে। সব জ্বালার অবসান হয়ে যাবে। বড় দুঃখ-দীর্ণ আত্মা যাত্রা করবে অশেষ শান্তির লীলাপথে। বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। অকুল তমসাঘন যামিনীর শিয়রে এ যেন একটি ক্ষীণ আলোর রশ্মি। টপ টপ করে পড়তে লাগল প্রিয়ার নয়ন-স্নাত বারি।

আর বিলম্ব কেন? ভোর হয়েছে। এবারে প্রাণ থাকতে থাকতে নিয়ে যাও উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

ভক্তবৃন্দ এলেন। এলেন সবাই গৌর-মন্দিরে। সুরু হয়ে গেল নাম সংকীর্তন। প্রাণের সুরে গাইছেন সবাই। ডাকছেন তাঁদের প্রিয় প্রভুকে। বিশ্বজননী চলে যাচ্ছেন। তুমি একবার এসো। এসে দেখা দিয়ে জুড়িয়ে যাও মায়ের তৃষিত হিয়া।

পালঙ্ক আনলেন ভক্তবৃন্দ। মুমূর্ষ শচীদেবীকে নতুন শয্যায় তুললেন ধরাধরি করে। চোখের জলে সবাই ধুয়ে দিলেন জননীর চরণ যুগল। রাখলেন আজন্মের মত একটি নমস্কার। শচীদেবী একবার তাকালেন দেখে নিলেন শেষবারের মত তাঁর নিমাইয়ের স্মৃতি চিহ্ন। নিয়ে আসা হল সুরধুনীর তীরে।

এই তো পথ, মহাপ্রস্থানের মহাপথ। রাত্রি অবসানের তীর্থ। ইঙ্গিতে শচীদেবী ডাকলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। জড়িয়ে ধরলেন তাঁর গলা। কি যেন বললেন অস্ফুটে। আর সময় নেই। ডাক এসে গেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া লুটিয়ে পড়লেন শচীমায়ের বক্ষে। সহসা একটা বাউল বাতাস বয়ে গেল বেগে। কাঞ্চনা বসে আছেন তাঁর প্রিয় সখী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধরে। ভক্তবৃন্দ কাঁদছেন অঝোরে। সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সকলে। জননীর মুখে তৃপ্তির সুধাস্পর্শ। প্রভু এসেছেন। শচীমাতা দেখছেন তাঁর নিমাইকে। কি যেন বলতে চাইলেন প্রিয়াকে। কিন্তু না, আর পারলেন না। মাথাটি বালিশ থেকে পড়ে গেল কাত হয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া ডুকরে উঠলেন জড়িমা জড়িত কণ্ঠে—'মা, মাগো ?'

আর কোন কথা নেই। সাড়া নেই। দেহটি প্রিয়ার এলিয়ে পড়ল। জাপটে ধরলেন কাঞ্চনা। জ্ঞান নেই। প্রভুকে দর্শন করেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে গিয়েছে প্রিয়ার। কিন্তু মূর্চ্ছা তো আর ভাঙ্গে না! ভয় পেয়ে গেলেন সবাই ? অবশেষে কাঞ্চনার চেষ্টায় ফিরে এল প্রিয়ার জ্ঞান। ধরে ধরে সুরধুনীর তীর থেকে দিয়ে এলেন তাঁকে বাড়িতে।

চলে গেলেন শচীদেবী। দুঃখের দুয়ারে খিল এটে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। গেলেন নিত্য থেকে অনিত্যে। চুপি চুপি মরণ এসে হরণ করে নিল, শচীদেবীর সব জ্বালা, সব বেদনা। লীন হয়ে গেলেন তিনি, পরম প্রকাশে চরম তৃপ্তিতে।

॥ তেইশ ॥

বড় একা লাগে।

আজ সত্যিই প্রিয়ার পাশে কেউ নেই।

সব দায় দায়িত্ব থেকে তিনি পেয়েছেন মুক্তি। উৎকণ্ঠা নেই। চাঞ্চল্য নেই। নেই আর বিন্দু ভাবনা। শাশুড়ীর জন্য তাঁকে আর কোনো দিন দুর্ভাবনার রজনী যাপন করতে হবে না। কেউ নেই। কিছু নেই। তাই তো সঙ্গী করে নিয়েছেন কান্নাকে।

প্রভুর কথাগুলো আজ বড্ড বেশী করে মনে পড়ছে। তিনি তো বলেছিলেন—তোমাকে কাঁদাবার জন্যই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করছি। তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না.

তাই তো বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদছেন করছেন কান্নার সাধনা। তাঁর কান্না দেখে জীব কাঁদছে। কার জন্য এ কান্না? ঈশ্বরের জন্য। এই কান্নার কীর্তনে বঙ্গদেশকে দীক্ষিত করবার জন্যই তো গৌর সুন্দরের অবতরণ।

সকাল হয়েছে। পূর্ব দিগন্তে উদয়ন হয়েছে সূর্যের। বিষ্ণুপ্রিয়া শয্যা ছেড়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে প্রাতঃ প্রণাম সেরে গেলেন স্নান করতে। স্নানান্তে ঢুকলেন মন্দিরে। বসলেন হাটু ভেঙ্গে একান্তে একাকী। সম্মুখে রয়েছে প্রভুর কাষ্ঠ পাদুকা। তাকিয়ে রইলেন তার পানে। অশ্রু অর্চনায় ধুয়ে দিলেন সেই পাদুকা। তারপরে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। রাখলেন প্রাণের প্রণতি। আত্মরতির সুখ সায়রে ডুবে যান বিষ্ণুপ্রিয়া। কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর। গৌরভজন-রত প্রিয়াজী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে ডাকেন প্রভুকে। কৃচ্ছ্র সাধিকার মত আত্ম নিগ্রহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন তিনি আত্মমগ্নতার পথে.

কিন্তু এত কঠোর তপজপ ও কৃচ্ছ্রব্রত সহ্য হয়না বংশীবদনের। প্রিয়াজীর দর্শনই মেলে না আজকাল।

এমন করে চলতে থাকলে আর ক'দিন থাকবে দেহ? এমন করে নিঃসঙ্গতার মধ্যে চললে কি করে বাঁচবেন তিনি? বংশীর বুকের মধ্যে টন টন করে ওঠে। চিন্তার রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ললাটে। আর বুঝি বিন্দু আসক্তি নেই প্রিয়াজীর। মায়া মুগ্ধ এ পৃথিবী থেকে চাইছেন বিদায়। তাই তো অমন সোনার প্রতিমা দুঃসহ তপ-তিতিক্ষায় গিয়েছে ক্ষীণ হয়ে। হৃদয়ের জ্বালায় দেহ জ্বলে, গিয়েছে পাণ্ডুর হয়ে।

কিন্তু সে দিকে একটুও খেয়াল নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। অবিরাম চলেছে নাম। নাম বন্যার খরস্রোতে ভেসে ভেসে তিনি চলেছেন গৌর-ভাব-সাগরে পারি জমাতে। উত্তরণ যে কবে হবে তা তিনিও জানেন না।

তাই তো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের দুয়ার। কেউ সেখানে যেতে পারে না। কেউ পায় না দেবীর দর্শন।

স্নানাহ্নিক শেষ করে সম্মুখে একটি পাত্র নিয়ে বসেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ওতে রয়েছে কিছু চাল। তা তুলে রাখেন আর একটি শূন্য পাত্রে। জপ শুরু হল। মগ্ন মনে জপাগ্নিতে এ যেন রন্ধনের প্রস্তুতি। একবার নাম জপ করেন। একটি তণ্ডুল তোলেন। রাখেন তা আর একটি পাত্রে। এক নাম, এক তণ্ডুল।

নিখুঁত হিসেব। নামে ছেদ নেই। বিরতি নেই। সকাল থেকে দুপুর। দুপুর থেকে বিকেল। তাকালেন পাত্রের পানে। কয়েক মুষ্টি জমেছে মাত্র। ধুয়ে আনলেন তা। তার পরে মুখে একটা কাপড় বেঁধে নিলেন—

'জপান্তে সে সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥'

এ অন্নের ব্যঞ্জন কি? শ্বাস, প্রাণায়াম আর কুম্ভক।

ভোগ লাগালেন বিষ্ণুপ্রিয়া সপ্ত উপকরণে। ভোগ লাগালেন সপ্তলোকাধিপতির। বন্ধ করে দিলেন ঘরের দরজা। অনেকটা সময় হল অতিক্রান্ত। দরজা খুলে বাইরে এলেন। এবার প্রসাদ গ্রহণের আয়োজন—

'বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমণি।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥'

দিনের শেষে নাম-সিদ্ধ অন্ন গ্রহণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া। অবশিষ্ট বিলিয়ে দেন ভক্তবৃন্দকে। তারা ধন্য হয়। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয় তাদের আঁখি। মহাপ্রসাদের অপূর্ব আস্বাদন!

ক্রমে ক্রমে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল জনারণ্যে। কঠোর তপা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বিধুর মূর্তি এসে অবলোকন করল সকলে। ফেলল তাঁরা চোখের জল। করল প্রিয়াজীর জন্য—হায়! হায়!

শুধু কি নদীয়ায়?

না।

তবে?

এ মর্মদীর্ণ সংবাদটি পৌঁছল গিয়ে অবশেষে নীলাচলে। প্রভু হলেন দুঃখিত। হলেন মর্মাহত। গৌরবক্ষ-বিলাসিনী আজ বিরহিনী, যোগিনী। একদা ছিলেন রাণী, আজ হয়েছেন কাঙ্গালিনী।

এমনি ধারাই—প্রবহমান গৌর বিরহে। হৃদয়ের সব আবিল ধুয়ে দেয় এ প্রেমধারা। পরিয়ে দেয় গৈরিক বসন। মন রূপান্তরিত হয় বৃন্দাবনে। যাত্রা করে ঐশ্বর্য থেকে মাধুর্যে। তখন সব কথা থেমে যায়। সব কান্না মন্ত্রের সুরে জীবন্ত হয়।

কিন্তু এ সংবাদটি প্রভুর মনে এনে দিল অন্য ভাব। তিনি আরো মগ্ন হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ বিরহের অশ্রুধারায় ভেসে চললেন

কৃষ্ণ চৈতন্য। পাগল হয়ে গেলেন তিনি। এক রকম আহার নিদ্রাও গেল বন্ধ হয়ে। সর্বদা হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে ধেয়ে যান কালিন্দীর উপকূলে।

আকাশে মেঘ জমে--প্রভু তার পানে তাকিয়ে পড়েন অধীর হয়ে।

তমাল তরুর নীচে গিয়ে আর পারেন না পথ চলতে। থমকে দাঁড়িয়ে শোনেন কালার পাগল করা বংশীধ্বনি। বৃক্ষকেই আবক্ষ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অঝোরে কাঁদতে থাকেন প্রভু। ভক্তবৃন্দ পড়েন চিন্তিত হয়ে। প্রভুকে একাকী ঘরে রাখা দায় হয়ে ওঠে।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর ভাবান্তরের সংবাদ শুনে ব্যথা পান। অতীত এসে কথা কয়ে যায়। বলেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে, "প্রভু, তুমি যে সব নিয়ম পালন করবে, তার চেয়েও কঠোর নিয়ম দেবে এই 'দাসী' কে।"

দেবী যে আজ সেই কঠোরেই বেঁধেছেন নিজেকে। নিজে কেঁদে কাঁদাবেন অপরকে

জীবের ভার গ্রহণ করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আর কেন? এবারে গৌরলীলার অন্তপর্ব। প্রভুর প্রাণপ্রিয়া, প্রিয়াজী আজ গ্রহণ করেছেন সন্ন্যাসিনীর ব্রত। এগিয়ে যাচ্ছেন উদ্বেগ তরঙ্গের ঢেউ ভেঙ্গে। প্রভু মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ। আর একটু কাঁদাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। শুধু বিষ্ণুপ্রিয়া কেন? কাঁদল সমস্ত জীবজগৎ। সে কান্নার মন্ত্র আজও রণিত ধ্বনিত হচ্ছে— আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, মর্মে—হা গৌর! হা গৌর!

প্রভু চলে গেলেন দিয়ে গেলেন প্রাণ হরণ মন্ত্র। দিয়ে গেলেন ভক্তের অন্তর অঙ্গনে—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে। মহানামের প্রেম ধারায় আজও ভক্তজন করেন অবগাহন। আজও গৌররূপ দর্শন করে ভাগ্যবান হন ধন্য।

কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। অবশেষে ঈশানও বিদায় নিল। এবারে প্রিয়াজীর পূর্ণাহুতির আয়োজন চলল।

'বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
দুই জনে অন্ন পান করিয়া বর্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সর্ব্বক্ষণ॥'

হে প্রভু! কার কাছে রেখে গেলে তোমার দাসীকে? ডাকো, ডাকো, আমাকেও এবারে ডাক দাও প্রভু!

গভীর রাত। এতক্ষণে বংশীবদন পড়েছেন ঘুমিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া আধঘুমে তন্দ্রায়িতা। এমনি এক নিথর রাত্রির স্তব্ধতায় প্রভু এলেন। এলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বললেন, 'আমার জন্যে তোমরা কেঁদো না। শোন, যে নিম গাছের নীচে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, আর যে নিম গাছের স্নেহচ্ছায়ায় বসে মা আমাকে স্তন পান করাতেন—সে বৃক্ষ দ্বারা নির্মাণ করো আমার দারু মূর্তি। প্রতিষ্ঠা কর নবদ্বীপ ধামে। তার সেবা কর। সেই দারুমূর্তির মধ্যেই তোমরা পাবে আমাকে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া সজাগ হয়েই উঠে বসলেন।
—কৈ, কৈ গো তুমি? এই তো ছিলে, মুহূর্তেই গেলে পালিয়ে!
—ওরে বংশী, এমন দেখলাম .র।

দেখেছেন বংশীও। তিনিও শুনেছেন প্রভুর আজ্ঞা। আর বিলম্ব নয়। নির্মিত হল দারু মূর্তি। দেখা হল শুভদিন। জানান হল ভক্ত মণ্ডলীকে আহ্বান। উদ্‌যাপিত হল মহা উৎসব। প্রতিষ্ঠিত হল নবদ্বীপ ধামে প্রভুর দারুমূর্তি। যাদব মিশ্রের পুত্রকে মন্দিরের কাজে নিয়োজিত করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। অবশেষে যাদব ও তাঁর ছেলে এসে গৌর সেবায় আত্ম সমর্পণ করলেন।

এ দিকে বংশী বিদায় নিয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন গৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস বংশী প্রভুর চরণ তলে।

শচীদেবী গেলেন। অপ্রকট হলেন প্রভু। অবশেষে ঈশান আর বংশীও ছেড়ে গেলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ওদিকে পিতৃকুলেও মা-বাবা কেউ নেই। সবাইকে হারিয়ে আজ বিষ্ণুপ্রিয়া শেষ যাত্রার আয়োজনে মগ্না।

আজ গৌর পূর্ণিমার শুভদিন। বিষ্ণুপ্রিয়া সখী কাঞ্চনাকে নিয়ে চলেছেন মন্দিরে। ধীর পদপাত। এসে দাঁড়ালেন মন্দিরের সম্মুখে। তাকালেন দারু মূর্তির পানে। চোখের তারায় স্থির দৃষ্টি। আর অশ্রোর ধারা। বড় ব্যথা পেলেন কাঞ্চনা তাঁর সখীর অবস্থা দেখে।

আরতি শুরু হয়ে গিয়েছে মন্দিরে। বিষ্ণুপ্রিয়া অপলক। সহসা চমকে উঠলেন কাঞ্চনা তিনি দেখলেন প্রভুর দারু মূর্তিতে হাসির চ্ছটা। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ, 'কাঞ্চনমালা! শীগগির একবার যাদবের কাছে যা!'

কাঞ্চনা শুধালেন, 'কেন?'

বললেন প্রিয়াজী, 'তাকে বল গে, 'আমি একবার মন্দিরে যাব।'

ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রিয়াজী আবার বললেন কাঞ্চনাকে, 'আরতি হয়ে গেলে যেন আমাকে ডাকে। আমি মন্দিরে ঢুকলে, যাদব যেন বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।'

কাঞ্চনা সব বুঝতে পারলেন। নীরবে মুছলেন শুধু চোখের জল। কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি। শুধু সখীর নির্দেশ মত কাজ করে গেলেন কাঞ্চনা।

যথাসময়ে শেষ হল আরতি। যাদব এসে ডাকলেন দিদিকে। বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করলেন। ঢুকলেন মন্দিরের মধ্যে। যাদব নির্দেশমত দরজাটি দিলেন বন্ধ করে।

ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগলেন—জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার

মহানাম। আজ আর শুধু গৌরাঙ্গ নয়, সঙ্গে যুক্ত হল বিষ্ণুপ্রিয়ার নামটি। কীর্তন কণ্ঠ উঠে এল গান্ধারথেকে ধৈবতে।

জমাট সঙ্গীত। অন্তর-হরণ সুর। এমনি করে কেটে গেল অনেকটা সময়। যাদব এবারে এসে খুলে ফেললেন মন্দিরের দরজা। কিন্তু এ কি! কোথায় বিষ্ণুপ্রিয়া? কোথায় সেই কনক দীপ্ত মরমীয়া মূর্তি? নেই, নেই, তিনি নেই মন্দিরে। সবাই খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু সন্ধান পেলেন না কেউই। আশ্চর্য! তবে কোথায় গেলেন বিষ্ণুপ্রিয়া? চির বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহদগ্ধ তনু পেয়েছে গৌর তনুর স্পর্শ। তাইতো গৌরবক্ষ বিলাসিনী আজন্মের মত মিলিয়ে গেলেন প্রভুর দারু মূর্তির সঙ্গে।

কাঞ্চনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ভক্তবৃন্দ এ অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে হলেন আনন্দ বিহ্বল। দুঃখের মধ্যেও তাঁরা খুঁজে পেলেন অশেষ গৌর মাহাত্ম্যের অভূতপূর্ব প্রকাশ।

কান্নায়, হাহাকারে নবদ্বীপ মূর্ছিত প্রায়। যাদব করুণ কণ্ঠে ডাকলেন, 'দিদি! দিদি!'

না কোনো সাড়া মিলল না। সব শেষ! দুঃখশ্রান্ত, রণক্লান্ত বিষ্ণুপ্রিয়া আজ আশ্রয় নিয়েছেন চির শান্তির, চিরকান্তির আনন্দ-লোকে। সব দহণ জ্বালার নির্বাসন শেষে তাঁর উত্তরণ হয়েছে গৌরসোনার প্রশান্ত অঙ্কে।

জয়গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।